এই দেশ এই সময়

প্রদীপ মিত্র

পরিবেশক :
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ, ১৯৪৮

প্রকাশক :
নমিতা মিত্র
ময়নাডাঙ্গা'
পোঃ—চুঁচুড়া রেলস্টেশন

মুদ্রক ঃ
মাতৃ মুদ্রণ
ফটকগোড়া, চন্দননগর

প্রচ্ছদ :
নিমাই দাসগুপ্ত

উৎসর্গ

নমিতা চৌধুরী (মিত্র)

-সার্বিক অবক্ষয়ের অন্ধকারেও যার প্রেরণা আলোকবর্তিকা।

সূচীপত্র

সাহিত্য যাঁদের কাছে নিছক বিনোদন তাঁদের জন্য নয়

সমান্তরাল

'জেঠু, তুমি সাঁতার জানো ?'

'জানি।'

'সাইকেল চালাতে ?'

'হুঁ।'

'ঘুড়ি ওড়াতে ?'

'হুঁ।'

'ঘুড়িব স্থতো মাঞ্জা করতে জানো ?'

'জানি না, যাও।'—ধমক দিলেন প্রিয়নাথ। 'যাও, ভেতরে যাও তো।'

গুটি গুটি ওয়ার্ডে ফিরে গেল ছেলেটা। প্রিয়নাথ আবার করিডরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই বিকেলে বড় ছেলে প্রিয়ব্রতকে বিদায় দিতে বাইরে এসেছিলেন। আর ভেতরে যাননি। চোখের ওপর সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমেছে। বকুল আর শিরিষের নিচে নিচে চাপ চাপ অন্ধকার। লোডশেডিং-এ বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর কেমন ভৌতিক অবয়ব। প্রিয়নাথের দৃষ্টি স্থির। চশমার কাঁচ ঝাপসা।

'আচ্ছা জেঠু, তুমি গাছে চড়তে পারো ?'

আবার এসেছে ছেলেটা।

প্রিয়নাথ বললেন 'হুঁ'।

'গাছে চড়াটা আমায় শিখিয়ে দেবে

'হুঁ।'

'অরণ্যদেবের মত গাছ থেকে গাছে যেতে পারো?'

'আঃ। পারি না।—যাও তো ভেতরে।' —ধমকালেন প্রিয়নাথ।

'তুমিও চল না জেঠু।'

হাত ধরে টানছে ছেলেটা। অগত্যা যেতে হয় ভেতরে। ওয়ার্ডে মোমের আলোয় ছেলেটা মেলে ধরেছে কাঁচের গুলি, মোমের টুকরো, দেশলাই-এর খালি বাক্স।

'এই দেখ জেঠু, কতগুলো দেশলাই পেলাম আজ।'—সোৎসাহে জানালো পিকলু। 'সব নতুন ছবি। সাতষট্টিটা হলো।'

হওয়ারই কথা। সারাদিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায়। চেনা-অচেনা যার কাছেই দেশলাই দেখবে নতুন ছবি থাকলেই খালি বাক্সটা চেয়ে নেবে।

'জানো জেঠু, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম সায়নের বাহান্নটা ছবি হয়েছে। আমার সায়নের থেকেও বেশি হয়ে গেল। জানো তো একশ আটটা হলেই একটা বল পাবো!'

'কে দেবে?'

'কি জানি। দোকানে বোধ হয়।' চোখ ঘুরিয়ে তাকালো ছেলেটা। 'আচ্ছা জেঠু, তুমি ম্যাজিক দেখাতে পারো?—দেশলাই-এর ম্যাজিক?'

'নাঃ।' ম্লান হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ।

'আচ্ছা, তুমি তো সাঁতার জানো। জোয়ারের জলে সাঁতার

কাটতে পারো ?' —চোখ বড় বড় হলো পিকলুর।—'ঝমঝম বৃষ্টি, শন্‌শন্‌ হাওয়া, বড় বড় ঢেউ—তুমি সাঁতার দিতে পারো নদীতে ?'

'না।'

'পারো না ? আমার বাপি পারে। বাপি বলেছে আমায় শিখিয়ে দেবে।'

'বেশ, আর কথা ব'লো না। এখন শুয়ে পড় তো।'

পিকলুকে বিছানায় শুইয়ে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরোলেন প্রিয়নাথ। করিডর অন্ধকার। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে ট্রলি আসছে। তাতে অসুস্থ মানুষ। পিছনে নার্সের হাতে মোমের আলো। কাঁপা কাঁপা আলোয় থামের আড়ালে গ্রীলের ধার ঘেঁষে ছোট্ট দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায়। দরজায় তালা নেই। প্রিয়নাথ আগেই দেখে রেখেছেন ঐ দরজার ওপাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। বাইরে দেওয়াল বেয়ে ওটা ঘুরে ঘুরে ছাদে উঠে গেছে।

করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। পরিপাশ ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছে। ম্লান জ্যোৎস্না মেখে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়িগুলো। বকুল আর শিরিষের নিচে অন্ধকারে এখন জোনাকির জ্বলা আর নেভা। আকাশে ফালি চাঁদের কোলে মেঘেদের আনাগোনা। ওরা এলোমেলো ভেসে বেড়ায়—নিঃসঙ্গ নিরালম্ব নিরুদ্দেশ—যেমন ব্যক্তি-মানুষের জীবন। যেমন প্রিয়নাথ। ভাসতে ভাসতে জীবনের দিগন্তে এসে পৌঁছেছেন। অবশ্য কোন মোহ নেই আর বাঁচার। কী হবে বেঁচে ? বাঁচা মানেই তো যন্ত্রণা—উদ্বেগ আর যন্ত্রণার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

ভাবলে অবাক লাগে, ডাক্তার যখন উইম্‌স্‌ টিউমার মানে ক্যানসার সন্দেহ করে হাসপাতালে পাঠালেন তখন প্রিয়নাথের সে কত দুর্ভাবনা ! কত দুঃখ। স্ত্রী ছেলেমেয়েকে ছেড়ে চলে যেতে হবে অকালে ? পরে যখন

বোঝা গেল রোগটা ক্যানসার নয়, হাইড্রোনেফরোসিস, অর্থাৎ প্রিয়নাথ বাঁচবেন, তখনই ওরা রোগশয্যায় পৌঁছে দিতে লাগলো একের পর এক দুঃসংবাদ।—বাড়ি-ভাড়া তিন মাস বাকি, মেয়ের কলেজের বেতন ছ-মাস বাকি, ছোট ছেলে প্রিয়গোপাল চাকরির পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদ যাবে, তার ট্রেনের টিকিট কাটা বাকি। প্রিয়নাথের তখন-ই মনে হ'ল তাঁর মরে যাওয়াটাও বাকি থেকে গেছে।

লোহার ঘোরানা সিঁড়িটা অবশ্য তখনও চোখে পড়েনি। পড়লেও সেটা কত দূরে পৌঁছে দিতে পারে সেটা মাথায় আসেনি। এল গত পরশু বিজয় আসার পর। করিডরের গ্রীলে ঠেস দিয়ে কথা বলতে বলতে বিজয় জানালো ইন্দ্রজিৎ-এর চাকরিতে ঢোকার খবর। সহকর্মী শীলবাবু রিটায়ার করতে বছর দুয়েক বাকি থাকতেই স্ট্রোকে মারা গেলেন। এখনও ছ'মাস হয়নি, এরই মধ্যে ইন্দ্রজিৎ অফিসে জয়েন করলো।

ভাবা যায়? এর থেকে বড় কিছু, সুখের কিছু কি ভাবা যায়? বড় ছেলে প্রিয়ব্রত গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে আজ আট বছর। ছোট ছেলেটাও যে কোন দিন চাকরি পাবে তার ভরসা নেই। মেয়েও বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। কেমন করে দেবেন? মাত্র তো বছর চারেক চাকরি আছে প্রিয়নাথের। তারপর কে চালাবে সংসার? অথচ এক নিমেষেই এসব সমস্যার চমৎকার সমাধান হয়ে যেতে পারে। এবং সমাধানটা একেবারে হাতের মুঠোয়। ঐ লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে সোজা নিচে লাফিয়ে পড়লেই ...

'জেঠু...।'

পিকলুর ডাকে সচকিত হন প্রিয়নাথ।

'এ কী! আবার তুমি উঠে এসেছো?'

'তুমি ঘুড়িতে লেজ লাগাতে পারো—খুব লম্বা লেজ?'

'কেন?'

'এবার বিশ্বকর্মা পুজোয় আমি লম্বা লেজ লাগিয়ে ঘুড়ি ছাড়বো। লেজে লেখা থাকবে আমার নাম। সুতো ছেড়ে ছেড়ে সুতো ছেড়ে ছেড়ে ঘুড়িটাকে এত দূরে পাঠাবো যে আমাদের ছাদ থেকে আর দেখাই যাবে না। একেবারে চাঁদের কাছে চলে যাবে। লেজে আমার নাম দেখে সবাই বুঝবে ওটা আমি উড়িয়েছি। বেশ মজা হবে,—না জেঠু?'

হাসছে ছেলেটা। হাঁপাচ্ছে। বেশ বোঝা যায় ক্লান্ত।

প্রিয়নাথ বললেন, 'বেশ, এখন ওয়ার্ডে গিয়ে শুয়ে পড় তো। এক্ষুণি একটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে …'

'আচ্ছা জেঠু, ক্যারাটে কি খুব শক্ত?'

'হুঁ।'—ছোট্ট জবাব দিয়ে নিস্পৃহ হতে চাইলেন প্রিয়নাথ।

'দু-বছরে শেখা যাবে না?'

'যাবে।'

'আর সাঁতার?—দু বছরে শেখা যাবে?'

'যাবে যাবে। যাও তো এখন।'

পিকলুকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন প্রিয়নাথ। ওয়ার্ডে ঢুকে গেল ছেলেটা। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে? পাঁচটা মিনিটও এক জায়গায় চুপ করে থাকতে পারে না। অথচ কঠিন অসুখে ভুগছে। লিউকিমিয়া। এই আট বছর বয়সের মধ্যে অন্তত আটবার ওকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। ঘুসঘুসে জ্বর হয়, বুকে পিঠে হাড়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে হয় যন্ত্রণা। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। রক্ত পরীক্ষা হয় বারেবারে। আর মাঝে মধ্যেই নতুন রক্ত ভরে দেওয়া হয় ওর শরীরে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওঁরা রোজ আসেন।

আজও এসেছিলেন। 'দাদা, দেখবেন ছেলেটাকে।'—বলতে বলতেই চোখে রুমাল চেপে ধরেছিলেন ভদ্রলোক। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বামী-স্ত্রীতে যখন কান্নায় ভেঙে পড়ছেন, ছেলেটা তখন করিডরে দাঁড়িয়ে কাগজ মুড়ে এরোপ্লেন বানাচ্ছে।

'তুমি এরোপ্লেন চড়েছো জেঠু?—আচ্ছা, পাহাড়ের মাথায় তো শুধুই বরফ, সেখানে এরোপ্লেন নামতে পাবে?···মনে করো এইটা পাহাড়—এভারেষ্ট।···এমনি করে এরোপ্লেন যাচ্ছে—বোঁ-ও-ও·· হুস্ স্ স···।'

এমনি সারাদিন। আপন মনে খেলবে, বকবক করবে আবার শুয়ে পড়বে বিছানায়। হাঁপাবে। প্রিয়নাথ চেয়ে চেয়ে দেখবেন ওর রোগা বুকের কঙ্কালের ওঠানামা।

ওয়ার্ডে ঢুকলেন প্রিয়নাথ। ছেলেটা ঘুমোলো কিনা দেখে আসা দরকার। তারপরই ছাদের সিঁড়িটা··

'এ কি? তুমি শোওনি!'

বিছানায় বসে কাঁচের গুলি আঙ্গুলে চেপে টিপ্ করছে পিকলু। প্রিয়নাথ কাছে যেতেই বড় বড় চোখ তুলে বললো, 'আচ্ছা জেঠু, তুমি যে বললে দু-বছরে সাঁতার শেখা যাবে,—চিৎ সাঁতার ডুব-সাঁতার, জোয়ারের জলে সাঁতার— সব কি দু-বছরে শেখা যাবে?' যাবে।'

'আর সাইকেল চড়া? দু-বছরে শেখা যাবে?'

'হুঁ।'

'আর গাছে চড়া?— অরণ্যদেবের মত এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাওয়া?—তাও দু-বছর শেখা যাবে?'

'আঃ বিরক্তিকর।' ধমক দিলেন প্রিয়নাথ।—'তুমি তখন থেকে কেবল দু-বছর দু-বছর করছো কেন বলতো?'

'বা রে !'—দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে বড় বড় চোখ তুলে চায় পিকলু।—'আরো দু-বছর বাঁচবো যে আমি! ডাক্তারবাবুরা বলছিলেন, আমি শুনেছি।'

প্রিয়নাথ হতবাক। যেন হঠাৎ লোডশেডিং-এ টি ভি স্ক্রীন থেকে মুছে গেল ছবি, বল না জেঠু, দু-বছরের মধ্যে সাঁতার, সাইকেল, গাছে চড়া, ম্যাজিক—সব আমি শিখে নিতে পারবো না?'

'পারবে, পারবে।'—ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ।—'এখন ঘুমোও'।

পিকলুকে বিছানায় শুইয়ে চাদর চাপা দিয়ে মাথায় হাত বোলালেন খানিক। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলেন ছেলেটা আপন মনে বিড়বিড় করছে—'একদিন দু-দিন··· পঞ্চাশ দিন একশ' দিন···তিনশ-পঁয়ষট্টি গুনিতক দুই···।'

করিডর এখন একেবারে ফাঁকা। আর অন্ধকার। চরাচর আরও শান্ত। মাঝে মাঝে শুধু ট্রলির কর্কশ আওয়াজে আর রোগীর আর্তনাদে সে নৈঃশব্দ অপারেশন টেবিলে শোয়ানো মানুষের মতন চিরে চিরে যাচ্ছে। তমাল বকুল শিরিষের কোলে জোনাকিরা জ্বলছে আর নিভছে। সমানে ঐ আকাশের ফালি চাঁদকে ঘিরে মেঘেদের অবিরাম আনাগোনা। প্রতিক্ষণেই নতুন নতুন মেঘ। ভাসতে ভাসতে আসছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন মানুষ। কিছুদিন নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় করো আর মঞ্চ থেকে বিদায় হও।

বিদায়! এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে পিকলু এবার স্বচ্ছন্দে উঠে যাওয়া যাবে ছাদে। প্রিয়নাথ গুটি গুটি এগোলেন করিডরের ওদিকে সেই ছোট্ট দরজাটার কাছে। পাশাপশি দেখে নিলেন এক পলক কেউ নেই। লোডশেডিং বলেই আরো সুবিধা।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। পা রাখলেন লোহার ঘোরানো সিঁড়িতে। বাইরের দেয়াল বেয়ে সিঁড়িটা উঠে গেছে ছাদে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে ঐ চার্চের ঘড়িতে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কেঁদে উঠলো প্যাঁচা।

আর দেরি নয়। নার্সের যদি নজরে আসে প্রিয়নাথ ওয়ার্ডে নেই তাহলেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। এই সুযোগ!--ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন প্রিয়নাথ। এই তো কার্ণিশ! ঐ তো জলের ট্যাঙ্ক! ··মৃতদেহটা প্রথম কার চোখে পড়বে? পিকলুর কি? আহা, বাচ্ছাটার রক্তের মধ্যে ক্যানসার! ··প্রিয়নাথের অফিসে খবরটা কখন পৌঁছবে? কাল অফিস আওয়ারেই পৌঁছে যাবে নিশ্চয়ই। প্রিয়নাথ সান্যালের নামের পাশে কী লেখা হবে?—ডায়েড ইন হারনেস—কর্মরত অবস্থায় মৃত। তারপরেই প্রিয়ব্রতর চাকরি! আঃ। আত্মহত্যা প্রমাণ হলে কি চাকরি দেয় না?—না না। হাসপাতালে মরলে আত্মহত্যা বলবে না কেউ। বড় জোর বলবে রোগীর এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল।

কার্ণিশে পা দিয়ে সিঁড়িটা ধরে টুক করে জলের ট্যাঙ্কে উঠে পড়লেন প্রিয়নাথ। ট্যাঙ্কে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখলেন। তারপর মাটি। অন্ধকার ভূতল ওকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। শূন্যে দু-হাত বাড়ালেন প্রিয়নাথ।

হঠাৎ চটাপট আওয়াজ। চমকে ওঠেন প্রিয়নাথ। নিচে ঝুঁকে দেখেন দু-হাতে তালি বাজাচ্ছে। কেউ আনন্দে লাফাচ্ছে।—'বাঃ বাঃ।'

প্রিয়নাথ শব্দ ক'রে, শ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত ট্যাঙ্ক থেকে নামলেন কার্ণিশে। কার্ণিশ থেকে পা রাখলেন সিঁড়িতে। তারপর পায়ে পায়ে নামতে লাগলেন নিচে। সাপ

যেমন বাঁশিওয়ালা ওঝার দিকে এগোয় তেমনি এগিয়ে দাঁড়ালেন ছেলেটার মুখোমুখি।

কিন্তু কী বলবেন ?

পিকলুই সোৎসাহে কথা বললো।

'তুমি তো বলোনি জেঠু তুমি সার্কাস জানো ! আচ্ছা, প্রাকটিস্ করলে তোমার মত আমিও দেয়াল বেয়ে কার্ণিশ থেকে জলের ট্যাঙ্কে উঠতে পারবো না দু-বছরে ? বল না জেঠু—দু-বছর তো অনেক সময়...

এই দ্বীপ ওই সোনাজল

সেদিন ট্রেন থেকে নেমে বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছি, পথ আটকে দাঁড়ালেন ভূপতিদা। ঘামে ভেজা মুখ, উস্কোখুস্ক চুল, নোংরা সার্ট। খুব ব্যস্ত।

'পার্থ, এই ফিরছিস? একটা কাজ করনা ভাই। এই রক্তটা একটু হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যা। তারকের অবস্থা খুব খারাপ।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই ভূপতিদা একটা থলি এগিয়ে দিলেন। থলিতে বরফের মধ্যে রক্তের বোতল। হাতে নিতে নিতে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'পেপটিক আলসারটাই এ্যাকিউট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারকের একটা ওষুধ এখানে পেলাম না। তাই শ্রীরামপুর যাচ্ছি। আমি চলি। গাড়ি ঢুকলো।'

বলতে বলতেই প্ল্যাটফর্মে দৌড়ে চলন্ত গাড়িটায় উঠে পড়লেন ভূপতিদা। সেদিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম আমি। তার পরই চোখ পড়লো হাতের থলিটায়। নোংরা, ভিজে আর ভারি একটা বোঝা। রাগে রি-রি ক'রে উঠলো সমস্ত শরীর।

আক্কেল বটে ভূপতিদার। অফিস থেকে বাড়ী ফিরছি দেখছে আর অমনি একটা ফালতু ঝামেলা চাপিয়ে দিয়ে গেল! সারাদিন

দৌড়ঝাঁপ খাটাখাটনির পর কোথায় বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম করবো, না এক্ষনি দৌড়তে হবে হাসপাতাল। কে না কে তারক, তার জন্য……

এই যাঃ। রিক্সায় উঠেই ভুলটা বুঝতে পারলাম। মারাত্মক ভুল। রক্ত তো পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। কিন্তু কোন্ তারকের কাছে? তাড়াতাড়ির মাথায় জিগ্যেস করা হলো না তো কোন্ তারকের অসুখ।

বেশ ক'জন তারককেই চিনি। তারক দাস তো আমাদের পাড়ারই। আমার থেকে দু-ক্লাস উচুঁতে পড়তো। বাপের ইটখোলা দেখাশুনা করে এখন। ওর পেপটিক আলসার! জানা ছিল না তো!

তারকচন্দ্র হালদারও হতে পারে। আমাদের এ দিকেই বাড়ি করেছে এখন। গঞ্জের বাজারে ওষুধের দোকান দিয়েছে শুনেছিলাম। ওর হঠাৎ পেপটিক আলসার হলো নাকি?—কিন্তু চেহারা তো ওর ভালই।

তারকদা অবশ্য বরাবরই পেটরোগা লোক। তারকেশ্বর ব্যানার্জী। আমাদের থেকে অনেক বড়। ভূপতিদার বয়সী। অফিস যাবার জন্য স্টেশনে এসেও কতদিন বাড়ি ফিরে যেতে দেখেছি। এমনি পেটের গোলমাল। তারকদারই কি বাড়াবাড়ি হ'ল?

হাসপাতালে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে আমি ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগলাম চারদিক। ছড়ানো ছিটানো বাড়িগুলো। আমি কোন্ দিকে যাব? রোগীর ওয়ার্ড-নম্বর বেড-নম্বর কিছুই তো জানি না। তাহলে? এত বড় হাসপাতালে কোথায় খুঁজবো তাকে? ওর বাড়ির লোকজন পাড়ার লোক কেউ কি নেই? নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে

আছে গেটে। তাদের হাতেই রক্তের বোতলটা দিয়ে দেওয়া যাবে।

হাসপাতালের অনেকগুলো গেট। প্রত্যেকটাই খুঁজে দেখতে হবে, উপায় কী?

কিন্তু গেটগুলোর ভিতর বাইরে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতেই আবার আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তারকের বাড়ির লোকজনকে যে আমি চিনবোই এমন কী মানে আছে? অবশ্য আমি ওদের না চিনলেও আমাকে ওরা চিনতে পারে। কিন্তু তাহলেই যে আমাকে ওরা ডাকবে এমন কোন কথা নেই। কারণ ওরা দাঁড়িয়ে আছে ভূপতিদার অপেক্ষায়, আমার জন্যে তো কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

ভাবতে ভাবতেই এলোমেলো ঘুরতে থাকি আমি। বিরাট বাড়িগুলোর আপাদমস্তক চোখ বোলাতে বোলাতে ক্রমশঃ ভিতরের দিকে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। বেশ বুঝতে পারছি এখন একটা মিনিট দেরি হয়ে যাওয়া মানেই……

আচ্ছা, এমার্জেন্সীতে একটু খোঁজ নিলে হয় না? রোগী ভর্তি করার আগে তো এমার্জেন্সীতেই নিয়ে যেতে হয়। ওখানেই তো এ্যাডমিশন রেজিস্টারে রোগীর নামধাম ওয়ার্ড-নম্বর লেখা থাকার কথা।

জোরে জোরে পা ফেলে আমি এমার্জেন্সীতে পৌঁছোই। কাউন্টারের এ পাশে গিজগিজ করছে মানুষ। ও পাশে কালো মোটা সোটা এক ভদ্রলোক। চশমা চোখে ঝুঁকে পড়েছেন পেল্লায় সাইজের একটা খাতার ওপর।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিই আমি।

'আমার একজন রোগী আছে……তারক……পেপটিক আলসার ……তার ওয়ার্ড-নম্বর বেড-নম্বর একটু যদি।'

কথা শেষ করার আগেই নিজের বোকামি টের পাই আমি।

রোগীর সম্পর্কে কিছুই তো জানি না, কবে ভর্তি হয়েছে তাও জানি না, এই অবস্থায়……

……মানে এই রিসেণ্টলি ভর্তি হয়েছে আর কি,…… এ্যাকিউট পেপটিক আলসার……রক্ত দিতে হবে,……তারক ……নিজের বোকামি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করি আমি।

ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে ঋজু দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন আমার মুখের উপর।

'রোজ কতজন এই হাসপাতালে ভর্তি হয় জানেন? —দুশো থেকে আড়াই শো। রোজ ছাড়া পায়ও প্রায় অত জন। আর মারা যায়—তাও জন বিশ ত্রিশ হবে। আপনি পেশেণ্ট-এর পুরো নামটাই বলতে পারছেন না আর আমি—'

'স্যরি।'—ব'লে ছিটকে স'রে আসি আমি। কিন্তু রক্তটা? রক্তটা যে পৌছে দিতেই হবে এখনি। নইলে হয়তো মারা যাবে তারক। তারকনাথ?—নাকি তারক দা?

কিম্বা সেই লম্বা ফর্সা তারকও হতে পারে। তারকেশ্বর ভটচাজ্। পাশেই সারদা পল্লীতে থাকে। স্কুলে পড়েছিলাম ওর সঙ্গে। ওর পৈতের যা মজা হয়েছিল এখনো মনে পড়ে। চার দিন ঘরে বন্ধ থাকার কথা ওর। আমি রোজ চুপি চুপি ওর ঘরের পাশে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে গল্প করতাম। ভাগাভাগি ক'রে পেয়ারা খেতাম। বেশি দূর লেখাপড়া করেনি তারা। পুজো আর্চায় লেগে গিয়েছিল অল্প বয়সেই। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তারা সাইকেলে যজমানদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুজোপাঠ করতো। এক বৃষ্টির দিন কলেজ থেকে ফেরার সময় পিছলে প'ড়ে ভীষণ চোট পেয়েছিলাম। রাস্তায় হাঁটতে পারছিলাম না। তারা সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ফেরার সময় আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে

গিয়েছিল। তারপর আমাকে সাইকেলে তু'লে নিজে হেঁটে হেঁটে সাইকেল ঠেলে আমায় বাড়ি পোঁছে দিয়েছিল। হাঁটুর মালাই চাকি স'রে গিয়ে দু-সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হয়েছিল আমায়। তারা রোজ আমাকে দেখতে আসতো দু-বেলা। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে রোজই বলতো—কিরে নিধিরাম সর্দার মাইনাস মালাই চাকি, কেমন আছিস ?

এই তারার যদি অসুখ হয়ে থাকে ? এদিকে সন্ধ্যে নেমেছে। আলো-আঁধারে বাড়িগুলোর কেমন ভৌতিক চেহারা। দেখে ভয় ভয় লাগে। কেমন যেন দিশেহারা মনে হয় নিজেকে। এখন প্রত্যেকটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে দেখা ছাড়া আর উপায় কী ? তাড়াতাড়ি সামনের বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাই আমি। করিডরে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। অন্ধকার বকুল গাছটায় পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনি। রক্তের বোতলটা হাত বদলে নিই। তারপর ওয়ার্ডে ঢুকে যাই।

করিডরের দুপাশে প্রশস্ত হলঘর। সারি সারি শয্যায় শায়িত মানুষ। কারোর শিয়রে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার, নাকের মধ্যে টিউব। কারোর হাতে বেঁধা সূঁচ। টিউব দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় স্যালাইন ওয়াটার ঢুকছে শরীরে। কিম্বা রক্ত। যন্ত্রনায় গোঙাচ্ছে কেউ। কেউ কাৎরাচ্ছে। ইস্ !.. ..

বড় অস্বস্তি লাগে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে দেখি সারি সারি শয্যার ব্যাকুল দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে আমার মুখে। কিন্তু কেউ পরিচিত নয়। দ্রুত পা ফেলি আমি। এক ওয়ার্ড থেকে আর এক ওয়ার্ড। গোঙানি কাৎরানি শূন্য ব্যাকুল দৃষ্টি জুলজুল চেয়ে থাকা—একই দৃশ্য। কিন্তু কোথায় সে ?

যদি সে তারক দাস হয় ? ইট-খোলার তারক ! ছেলেবেলায়

একবার পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। সাঁতার জানতাম না। ডুবছি, উঠছি, জল খাচ্ছি আর দেখছি পাড়ে লোকজনের ছুটোছুটি, হৈ চৈ। হঠাৎ কোত্থেকে তারকদা এসে হাজির। (ছেলেবেলায় তারকদা বলতাম, বড় হয়ে শুধু তারক।) পায়জামাটা একটু গুটিয়েই ঝপাৎ ক'রে লাফিয়ে পড়ল জলে। সাঁতরে এল আমার কাছে। দড়াম্ ক'রে মারলো মুখে এক ঘুসি। আমি নিস্তেজ হয়ে যেতেই প্যান্টের বকলস ধরে টেনে টেনে তুললো ডাঙায়। কতদিন আগের কথা। মনেই ছিল না এত দিন। তারকদাই যদি হাসপাতালে······ ।

ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ড ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মন। স্মৃতিতে একটা প্রাণোচ্ছল মানুষ, চোখের সামনে মুমূর্ষু রোগীরা। কিছুতেই মেলাতে পারিনা। হাসপাতালের ওয়ার্ডে প্রথম ঢুকলে কি এরকমই লাগে? এখানে এই ভাবে মানুষ পাশা-পাশি বিছানায় শুয়ে কাৎরায়! এই ভাবে জুলজুল চেয়ে থাকে! এই ভাবে······এই ভাবে······বাঁচে কিম্বা মরে যায়!

জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে তারকও এই ভাবে চেয়ে আছে নিশ্চয়ই। রক্তের অভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে হয়তো। আমার হাতের মধ্যেই ওর সঞ্জীবনী, অথচ·········অথচ কোথাও যে খুঁজে পাচ্ছি না তাকে! হয়তো ছেলেবেলার বন্ধু! অন্তরঙ্গ সাথী ছিল এককালে। হয়তো······হয়তো তারু। হ্যাঁ তারু ও তো হতে পারে। মানে তারকেশ্বর মণ্ডল। ইস্ এতক্ষণ তো তারুর কথা মনে পড়েনি আমার। খুব গরীব ঘরের ছেলে। পাটকল থেকে ছাঁটাই হয়ে পাগল হয়ে যান ওর বাবা। ওর মা তখন বাড়ি বাড়ি ঝি-এর কাজ ক'রে ঠোঙা আর বাজির রাঙ্গ বানিয়ে, মুড়ি ভেজে, কোন রকমে সংসার চালাতেন। স্কুলের

শেষ পরীক্ষাতেও বসতে পারেনি তারু। অথচ ক্লাশ পরীক্ষায় বরাবর প্রথম হতো সে। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেভেন্ কিম্বা এইটে পড়বার সময় অঙ্ক শেখবার জন্য কতদিন ওদের বস্তিতে গেছি আমি। ক্লাস নাইনের ফাইন্যাল পরীক্ষায় তারুর খাতা দেখে আমি ইংরেজী রচনা লিখে নিয়েছিলাম। নইলে সে বছরটা নির্ঘাৎ থাকতে হতো ক্লাশে। তারুর সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। শেষ কথা-বার্তা বোধ হয় আমার বাবা মারা যাবার সময়—বছর পাঁচেক আগে। ঘোর বর্ষা—দারুন দুর্যোগ—বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না কেউ। তারুই তো লোকজন ডেকে কাঠ জোগাড় করে বাবাকে কাঁধে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিল।

তারুকে মাঝে মাঝে দেখি রাস্তায় ঝাণ্ডা উঁচিয়ে মিছিল করে যায়। রাজনীতি করার জন্যেই বোধ হয় ক্যাজুয়াল লেবার এখনো। ওরই কি……

ঢং ঢং ঘন্টা বাজছে কোথাও। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার ঘন্টা কি? চকিতে ঘড়িতে চোখ পড়ে। ইস্, প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেল এর মধ্যে! তাহলে কি রক্তটা শেষ পর্যন্ত… ..

উদভ্রান্ত ভাবে আমি একজন নার্সের দিকে এগিয়ে যাই।

'আচ্ছা সিসটার, পেপটিক আলসারের রোগী, রক্ত দেওয়া দরকার ·····মানে দেওয়া চলছে।—কোন্ ওয়ার্ডে থাকতে পারে?'

'সেটা কি ডেফিনিটলি বলা যায়? তবে মেইন মেডিক্যালে দেখতে পারেন।'

'কোন্ দিকে ওটা?'

'ঐ ওদিকে লাল বাড়ি। সি ব্লক।'

এবার আমি ধুপধাপ সিঁড়ি ভাঙি। নিচে নেমেই দৌড়োই।

বাগানের মত ঘেরা জায়গাটায় আগাছার জঙ্গল। শুকনো ফোয়ারা। ফোয়ারার ধাপিতে বসে গাঁজা টানছে দু-জন। তাদের পাশ দিয়ে সর্টকাট পথ। লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে আমি বুকের ধুক্‌ধুক টের পাই। এইবার, হ্যাঁ এইবার আমি তারকের কাছে পৌঁছতে পারবো। সে এখনো বেঁচে আছে তো? নাকি এতক্ষণে······

কিন্তু কোন্ তারক? আমাকে 'মাইনাস মালাইচাকি' ব'লে ডাকতো যে সেই তারক? আমার বোনের যেবার প্লুরিসি হয় ঐ তারাই তো হাসপাতালে ভর্ত্তির যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। বোনের বিয়ের সম্বন্ধও এনেছিল সে বছর পাঁচেক আগে। তারই অসুখ? নাকি···তারকদা মানে ইটখোলার তারক—যে আমায় জল থেকে তোলে তার? কী-সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল তারকদার! ছেলেবেলায় ব্যায়াম করতো যে! হাতের পেশী ছিল ফোলা ফোলা। চওড়া কব্জিতে ছিল অসুরের শক্তি। চন্দননগরের বয়েজ ক্লাবের মাঠে ফুটবল ফাইন্যালে যেবার মারপিট হয়······ওঃ সে কি কাণ্ড! ইট পাথর বাঁশ বেড়াভাঙা তারকাঁটা যে যা পাচ্ছে তুলে মারছে। পালাবার আগেই দেখি তিন চার জনে ঘিরে ফেলেছে আমায়। পেটাচ্ছে। দৌড়ে এসেছিল তারকদা। ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল করেছিল আমায়। খালি হাতে লড়তে গিয়ে বেদম মার খেয়েছিল। জালের তার কিম্বা পাথর-কুচো কিছু একটার খোঁচায় ওর ডান চোখ কেটে রক্ত পড়ছিল—এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। এখনো তো সেই দাগটা দেখা যায় ওর চোখের ভেতর।

ইস্। টপ টপ করে কী পড়ছে যেন! ভিজে যাচ্ছে আমার পা। রক্তটা নয় তো? ত্রস্তে থলির ভিতর থেকে বোতলটা বার করি আমি। না, বোতলটা ভাঙেনি। বরফ গ'লে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। কিন্তু রক্তটা যে গরমে নষ্ট হয়ে যাবে! ইস্

কতক্ষণ আমাকে ভূপতিদা রক্তটা দিয়ে পাঠালেন……

আচ্ছা, ভূপতিদা কি 'তারক' বলেছিলেন? নাকি 'তারা,' 'তারু' কিম্বা 'তারকদা'—এমনি কিছু? তাহলেও কিছুটা আন্দাজ করা যেত কোন্ তারকের জন্যে রক্তটা দরকার। রক্ত তো দুষ্প্রাপ্য। নিশ্চয়ই হাসপাতালে পাননি। তাই বাইরে ছুটোছুটি ক'রে ……।

রমা মানে আমার স্ত্রীর ডেলিভারির সময়েও তো রক্তের জন্য এমনি ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। আর হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেদিন শীতের রাত—রাত তখন অনেক—ডেলিভারি পেইন উঠল রমার। রাস্তায় যানবাহন নেই। কনকণে শীতের মধ্যে গায়ে একটা শস্তা চাদর জড়িয়ে তারু এসে হাজির। পাটকলের ডিউটি থেকে ফিরছে। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মুখ বাড়িয়ে বললো, 'কীরে, জেগে আছিস যে এখনো। কী খবর বৌ-এর?'

'তারু তুই!'—হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলাম আমি। 'আয় না ভাই। পেইন উঠেছে রমার।……আমি বাড়িতে একা।…… গাড়ি পাচ্ছি না……।'

তারুই ছুটোছুটি ক'রে নিয়ে এসেছিল রিক্সা। আমার সঙ্গে গিয়েছিল নার্সিং হোম। ব্লাডব্যাঙ্কে নিজে রক্ত দিয়ে নিয়ে এসেছিল রক্ত। সারারাত ছিল পাশে। পরদিন ডিউটিতে না গিয়েও ছিল। ছেলেকে দেখে হেসে বলেছিল, 'পার্থর ব্যাটা, তোকে কী নামে ডাকবো? তুই সারথি। পার্থর গাইড।'

এই সারথি নামটাই থেকে গেল। অন্নপ্রাশনে এসে তারাও ঐ নামেই আনুষ্ঠানিক কাজ সেরেছিল। সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল, 'কোথায় সারথি? মাইনাস মালাই-চাকির ছেলে প্লাস মালাইচাকি যদি সারথি হয়, আমি তবে পুরুত নই, আমি তার ঘোড়া। কই হে?'

আর ইটখোলার ব্যায়ামবীর তারকদা কী বলেছিল? সারথির দু-হাত টিপে বলেছিল, 'শুধু প্লাস মালাইচাকি হলেই চলবে না বাপ, হতে হবে প্লাস মাস্‌ল্‌, তার মানে আর কটা বছর পর থেকেই প্লাস রেগুলার একসারসাইজ, তবে না খেলার মাঠে মারপিট হলে স্রেফ খালি হাতে চারজনকে...... ।'

এত সব ছবি স্মৃতির কোন্‌ অতলে তলিয়ে ছিল কে জানে? এখন ফিল্মের স্টক্‌ শট্‌ এর মতই ভেসে উঠছে মনে।

ওয়ার্ডে ঢুকতেই ফিল্ম কেটে গেল। সারি সারি শয্যা, অসুস্থ মানুষ, জুলজুল চোখ, নির্নিমেষ চেয়ে থাকা। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা। ঘন দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু কেউ তারক নয়। কাউকে আমি চিনি না।

আচ্ছা তারককে দেখলে আমি চিনতে পারবো তো?

দু পাশের বিছানার পাশ দিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। নাঃ, এরা কেউ তারা, তারু কিম্বা তারক নয়। হয়তো প্রদীপ, সুদীপ, দিলীপ, সন্দীপ, শম্ভু, পঞ্চানন কিম্বা অন্য কেউ। এবং এদের দেখতে আসার কথা স্বপন, তপন, অয়ন, মহীতোষ কিম্বা অন্য কারোর। আমার সঙ্গে এদের কারোর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারকের সঙ্গেই কি আমার কোন সম্পর্ক আছে? থাকলে তো তার অসুখের কথা আমার না জানার কথা নয়। সন্দেহ নেই খুবই কাছের মানুষ সে। নইলে যত তাড়াই থাক ভূপতিদা আমার হাত দিয়ে তার জন্যে রক্ত পাঠাতেন না।

যে করেই হোক, হ্যাঁ রক্তটা যেমন ক'রেই হোক আমার তারকের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে। তারা, তারু, তারকদা— যেই হোক।

কিন্তু ওয়ার্ড যে শেষ হয়ে গেল! ওয়ার্ডের ওপাশে দরজা। বাইরে সংকীর্ণ করিডরে অন্ধকার। সেখানে দাঁড়াতেই এক ঝলক

পচা দুর্গন্ধ। সামনেই একটা ফ্যাকাশে হলুদ রঙের ঘর। মর্গ নাকি? তার সামনে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েকজন।

একজন এগিয়ে এল আমার কাছে,—ভূপতিদা। 'পার্থ, তুই বাড়ি চলে যা। আমি আর এখন গিয়ে কী করবো? ডেথ সার্টিফিকেটটা পেলেই সোজা শ্মশানে নিয়ে যাব।'

নিতান্তই সাদামাটা কথা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই যাদের স্বভাব তারা বোধহয় এভাবেই কথা বলে। কিন্তু বিঁধে যাচ্ছে যে আমার বুকে। তারক তা হলে আর নেই!! রক্তের অভাবেই কি ও মারা গেল?

হাতের ভিজে থলিটা আমি প্রাণপণে পিছনে লুকোবার চেষ্টা করি। তারক কি আমার জন্যেই······? কিন্তু কোন্ তারক?

'আর হ্যাঁ, পার্থ, শোন্। এই জিনিষগুলো তারকের বাড়িতে একটু পৌঁছে দিস তো।'

বাঁ হাত পিছনে রেখে ডান হাত বাড়াই আমি। কিন্তু কার বাড়িতে পৌঁছে দেব এগুলো? কোন্ তারক সে?

ছেলেবেলায় জলে ডুবতে ডুবতে একটুখানি অক্সিজেন, প্রাণ-ভরা একটা শ্বাসের জন্যে যেমন ছটফট করেছিলাম আমি তেমনি হাতড়াচ্ছি আমার মন। মনের মধ্যে অন্ধকার। কোন্ তারক? কোন্ তারক ছেড়ে চলে গেল আমায়?

প্রশ্নটা কিন্তু কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারি না আমি। কথাটা ঠোঁটে এসেও আটকে যায়। মনে হয়, এমন একদিন যদি আসে যেদিন প্রদীপ, সুদীপ, সন্দীপ, স্বপন, তপন, তারক কিম্বা অন্য কেউ যদি ভূপতিদা, মন্মথদা, নিখিলেশদা কিম্বা অন্য কাউকে ঠিক এমনি এক পরিবেশে এমনি এক প্রশ্ন ক'রে বসে : কোন পার্থ?

জীবনের ঘ্রাণ

ঘটনাটা অদ্ভুত। যেন স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের মতই বুঝি অলৌকিক। না হ'লে যা সবার চোখে পড়ে তা আমার চোখে পড়ে না, যে গন্ধ সবাই পায় তা আমি পাইনা—এ কেমন ক'রে হয়?

অথচ লোকগুলোর সঙ্গে জল থৈ থৈ রাস্তায় নেমেও আমার মনে হয়নি একটা সাজানো নাটকের মধ্যে গিয়ে পড়তে চলেছি আমি। কেবল আধো-অন্ধকারে ও'দের নাকে রুমাল লক্ষ্য করে আশ্চর্য লাগছিল। পোড়ো বাড়িটা তো বেশ খানিকটা দূরে। আর মড়া-পচা দুর্গন্ধটা—ওরা এসে বললো—ঐ বাড়িটা থেকেই নাকি বেরোচ্ছে। গন্ধটা কি এতদূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে নাকি?

ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগলেও ওদের সঙ্গে ঐ বৃষ্টির মধ্যে ছপছপ জল ভেঙে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। পাড়ার লোক ওরা। মুখ চেনা প্রায় সবাই। আমার পোড়ো বাড়িটার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখবে কোন মানুষের লাশ আছে কিনা।

বেরোতে অবশ্য আমি চাইনি কিছুতেই। যথারীতি সন্ধ্যে থেকে টি ভি স্ক্রীণের সামনে আধ শোয়া হয়ে ছিলাম দোতলার

বিছানায়। আফ্রিকার একটা উদ্দাম ট্রাইবাল নাচ দেখছিলাম তন্ময় হয়ে,—এখন এই দুর্যোগের মধ্যে রাত্তি:র বাই'র বেরোব—এমন পাগল আমি নই।

কিন্তু নাছোড়বান্দা ওরা। নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাটকের সংলাপের মত বলে যাচ্ছিল অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে অনেক কথা। আমি তবু ওপরের ব্যালকনি থেকে ওদের দিকে চাবি ছুঁড়ে দিয়ে ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিলাম। লাশ খুঁজতে হয় তো ওরাই গিয়ে পোড়ো বাড়িটাব তালা খুলুক। কিন্তু কানের কাছে ফিসফিস করলো স্ত্রী। এতগুলো লোক ডাকতে এসেছে, না বেরোলে ওরা চটে যাবে নির্ঘাৎ। হয়তো শা ন্তিতে টিকতেই দেবে না। এমনিতেই তো পাড়ায় আমার মেলামেশা একদম নেই। পাড়ার লাইব্রেরী, ক্লাবের নাটক, ফুটবল টুর্ণামেণ্ট কিম্বা পুজো—কোন ব্যাপারেই আমি থাকি না। তাব ওপর আমারই বাড়িতে মরা মানুষ, আমি যদি না দেখতে যাই ঝামেলা হতে কতক্ষণ? পুলিশী ঝামেলাতেও ফেলে দিতে পারে পাড়ার লোক।

অগত্যা তাই বেরোতেই হ'ল। ছাতা আর টর্চের সঙ্গে চুপি-চুপি প্যাণ্টের হিপ পকেটে সার্টের আড়ালে লুকিয়ে নিয়েছিলাম আমার রিভলভারটা। দিনকাল তো ভাল নয়। লোকগুলোর মনে কোন মতলব আছে কিনা কে বলতে পারে? চেনা লোক—প্রতি-বেশী, কিন্তু সোস্যাল স্টেটাস্-এর দিক থেকে তো অনেক নীচে। বুঝি তো সবাই ভয়ানক ঈর্ষা করে আমায়। প্লেইন জীলাসি। ছেলেটাকে ডাক্তারি পড়িয়েছি, কলকাতায় গিয়ে দারুন প্র্যাকটিস জমিয়েছে সে। আমার একটিই মেয়ে, সুন্দরী—বিয়ে দিয়েছি এক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ভগবানের ইচ্ছেয় ধার-দেনা না করেই এই ছিম-ছাম দোতলা বাড়িটা বানিয়ে ফেললাম, টি ভি-ফ্রীজ-টেলিফোন

নিয়েছি—এতেই লোকের চোখ ওঠে জানি। নকশাল-ফকশালদের ঝামেলা অবশ্য এখন আর নেই। তবু বলা তো যায় না কিছুই। একটু তৈরী হয়ে বেরোনই ভাল।

রিভলভার প.কেট নিয়ে বেরোলাম তো, কিন্তু জল থৈ থৈ রাস্তায় নেমেই মনে হ'ল—হয়তো ভুল করলাম। আমি একা আর ওরা অতগু:লা বাইরে নিয়ে গিয়ে আবার·········

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। সেইসঙ্গে কড় কড় কড় কড় মেঘের ডাক। বৃষ্টি পড়ে চলেছে সমানে। বাতাস আছে। ঠাণ্ডা বাতাসে শীত শীত ভাব। ল্যাম্প-পোস্টের ম্লান আলোয় আমি লোক-গুলোর মুখ লক্ষ্য কবতে চাইলাম। কিন্তু নাকে রুমাল চাপা। মুখেব ভাব বোঝা-ই যাচ্ছে না।

'কিন্তু মরতে কে আসবে ঐ পোড়ো বাড়িতে ?'—অস্বস্তিটা গলায় চেপে আমি হাঁট.ত হাঁটতেই বললাম।

'হয়তো আশ্রয় নিয়েছিল কেউ। তাবপর দেয়াল চাপা প.ড় বা যেভাবেই হোক মারা গেছে।'—জবাব দিল কেউ।

'কিম্বা আত্মহত্যা।'

—যে বলে তার কথা শেষ হতেই কালো আকাশ ফালা ফালা ক'রে বিদ্যুৎ চমকায়, ঝল:স ওঠে চারপাশ আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ে। আমি চমকে উঠি। ভয় পাই। বলি, 'কিন্তু দরজায় তো তালা, ঢুকলো কী ক'রে ?

দেয়াল-ফেয়াল তো ভাঙাচোরা।'—উত্তর দিল একজন। '—একটু চেষ্টা করলে ঢোকাব আর অসুবিধে কী ?'

শুনে বিরক্ত হলাম। একটা বাউণ্ডুলেকে ঐ পোড়ো বাড়িটায় থাকতে দিয়েছিলাম বিনা ভাড়ায়—যাতে একটু দেখা-শুনা হয়। সে ব্যাটা কোথায় যে কাটলো !

প্যাণ্ট বেশ খানিকটা গুটিয়ে হাঁটুজল ভেঙে হাঁটতে হচ্ছে এখন। জলের ওপরে কাঁপছে টর্চের আলো। বৃষ্টিটা আরো বাড়লো।

'এই দুর্যোগ কবে যে কাটবে!'—স্বগতোক্তির মত বললাম আমি।

'হ্যাঁ।'—ওদের কেউ বললো, 'কত জনের কত সর্বনাশ যে হ'ল! হপ্তাভ'র ঝড় জলে ঘর ভেঙেছে পাড়ার কত লোকের। এদিক ওদিক ঘুরে মরছে মাথা-গোঁজার একটু ঠাঁই-এর জন্য।'

'তাই বুঝি?'—আমি অবাক।

'হ্যাঁ। খাওয়া জুটছে না ঘরে ঘরে। কাজকর্ম তো অনেকেরই বন্ধ।'

'ও!……'

'পাড়ার ক'জনের তো খোঁজই নেই দু-তিন দিন ধ'রে।'

'তাই নাকি?'

'আপনি খবর রাখেন না কিছু?'—কর্কশ গলায় কেউ বললো।

'কী ক'রে রাখবো? ক'টা দিন তো বাড়ি থেকে একদম বেরোতেই পারিনি। স্রেফ টি. ভি.—ষ্টিরিও-থ্রিলার নিয়ে কাটাতে হয়েছে। অফিসে পর্যন্ত যেতে পারিনি। টেলিফোনেই যেটুকু যোগাযোগ……'

কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো কাছাকাছি। আমি চমকে উঠলাম। আমার কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে কেউ বললো, 'একজন মারাও গেছে দেয়াল চাপা প'ড়ে।'

কে মারা গেছে জিগ্যেস করলাম না আমি। ছপছপ জল ভেঙে হেঁটেই চললাম। খানিক এগিয়ে রেল-লাইন পেরিয়ে নীচু জলা জমি। রাস্তায় রীতিমত স্রোত। ল্যাম্পপোস্টের বাল্বগুলো ভাঙা! তাই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথ চিনে আমরা

এগিয়ে চলেছি। মাথার ওপরে ক্রমাগত ঝিরঝির বৃষ্টি, সঙ্গে ঝ'ড়ো হাওয়া। বিদ্যুতের চকিত ঝলসানিতে চমকে উঠছে লোকালয়। লোকালয় মানে অবশ্য দরমার দেয়াল আর টালির চালের সার সার ঘর। সেগুলো পেরোলে ক'টা পলেস্তরা-না-করা ছোট বাড়ি। নোংরা খাটাল। রাস্তায় কাদা। গোবরের ভ্যাপসা গন্ধ। যত সমাজ বিরোধীদের আড্ডা এদিকটায়। ভাবলেও ঘৃণা হয় আমার জীবনের একান্নটা বছর আমি এই জায়গায় কাটিয়েছি!

ঐ তো দেখা যাচ্ছে আমার সেই ভাঙাচোরা ইট বার করা বাড়িটা। বাড়ি না ব'লে বাড়ির কঙ্কাল বলাই ভাল। অন্ধকারে প্রেতপুরী। বিদ্যুতের ঝলসানিতে যেন দাঁত বার ক'রে বীভৎস হেসে উঠলো। সেই হাসি লক্ষ্য ক'রে দলটি স্রোতের তলায় হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে। ওদের নাকে কাপড়।

'ভোলা-দা দু'দিন বাড়িতে নেই।'—কেউ বলল।

'কে ভোলা-দা?'—আমি জিগ্যেস করলাম।

'পাড়ার পোস্টম্যান—চেনেন না? শুনলুম পরশু চালের সন্ধানে বেরিয়েছেন, তারপর থেকে খবর নেই।'

'ও!...'

'জগন্নাথেরও খোঁজ নেই কাল সকাল থেকে।'

'কে জগন্নাথ?

'এঃ, জঘন্য। উৎকট!'—মুখে কাপড়ের আড়াল থেকে কেউ বলে।

'কী?'—আমি তার মুখের দিকে তাকাই।

'গন্ধটা।—পাচ্ছেন না?'

'কই?'

'আমাদের তো গা গুলিয়ে উঠছে। আপনার কি সর্দি বসেছে

নাকে ?'

সর্দি আমার হয়নি। এ্যালকোহলও পেটে পড়েনি আজ। তাহলে গন্ধটা পাচ্ছিনা কেন ?আশ্চর্য তো ! কিন্তু ওদের কাছে নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা তো প্রকাশ করা যায় না। তাই বার-দুই নাকে ফোঁসফোঁস আওয়াজ ক'রে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ্যাঃ বিশ্রি তো !'

নাকে রুমাল চেপেই বাড়ির দরজার তালা খুললাম, আমি। উঠোনে জলের তলায় আগাছার জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে খসখস করে কুকুর শিয়ালের মত চলে গেল কিছু। মাটিতে লাঠি ঠুকে ঠুকে দলটি এগিয়ে চলেছে। ইচ্ছে করেই আমি সামনে থাকি না। এক্ষুণি হয়তো ফোঁস ক'রে উঠবে সাপ।

'জগন্নাথের কী হয়েছে বললেন না তো।'—হালকা হবার জন্যে আমি বললাম।

'চটকল বন্ধ হওয়া ইস্তক ছেলেটা তো হন্যে হয়ে ঘুরতো একটা কাজের জন্যে। প্রায়ই ওর বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না।'

'অ। কিন্তু তার জন্যে মরতে হবে ?' বলতে বলতেই বারান্দায় উঠি আমি। খোলা বারান্দায় মাকড়সার ছেঁড়া জাল, পাখির ভাঙা বাসা, ঝুল। চামচিকে শব্দ ক'রে উড়ে গেল। এক কোণে গুটিগুটি শুয়ে আমাদের দেখছে একটা কালো কুচকুচে কুকুর। আমাদের টর্চের আলোগুলো নোনা ধরা ইটের কঙ্কালের ভেতর ঘোরাফেরা করছে।

সামনের ঘরটাই আমার বসার ঘর ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে এগোই। পিছনে নাকে কাপড় চেপে ওরা। দরজা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলি। কেউ নেই। লাশ নেই। মেঝেয় মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে আমার ভাঙা-চোরা বুক-কেসটা। রবীন্দ্র রচনাবলীর পুরো সেটটা থাকতো এতে। উইপোকায় সব কেটে

ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছিল। একটি পাতাও পড়া হয়নি। একটা দাঁও-মারা টাকায় শখ ক'রে বানিয়েছিলাম বুক-কেসটা। ভাবলে এখনো বুক কড়কড় করে।

'মহেশবাবুর মেয়ে অপর্ণাকে চেনেন তো?' ওদের একজন হঠাৎ জিগ্যেস করে।

'কে মহেশবাবু?'

'পাড়ার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। আপনার গলিতেই থাকেন'।

'ও .....'

'অপর্ণার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল, এই অবস্থায় বাড়ি-ঘর ভেঙে সব ভেস্তে গেল। কাউকে কিছু না জানিয়ে অপর্ণা বেরিয়ে গেছে কাল। সবাই ভয় পাচ্ছে মেয়েটা না আত্মহত্যা ক'রে বসে।'

'হুঁঃ। আত্মহত্যাটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেল দেখছি।' পাশের ঘর খুলতে খুলতে আমি বললাম। এঘরেও লাশ নেই। সোফা-টেবিলের ভগ্নাংশগুলো মেঝেয় গড়াচ্ছে শুধু।

এবার দোতলার ভাঙা চোরা সিঁড়ির দিকে এগোই আমরা। দুর্গন্ধটা কিন্তু আমি এখনো পাই না। তবু রুমাল চেপে থাকি নাকে। বলি, 'আত্মহত্যা করা মানে নিজেকে খুন করা। নিজের জন্মগত সংগ্রামী সত্তাকে খুন ক'রে সমাজ-বিমুখ স্বার্থপরের মত জীবন থেকে পালানো। —এমন মানুষের না বেঁচে থাকাই ভাল।'

খুক খুক ক'রে কাশে কেউ। কাশে নাকি হাসে ঠিক বুঝতে পারি না আমি। সিঁড়িতে পা রেখে বলি, 'অনেক স্ট্রাগ্‌ল্ ক'রেই তো মানুষকে বড় হতে হয়। এই আমার কথাই ধরুন না। কত স্ট্রাগ্‌ল্ ক'রে আমাকে হায়ার এডুকেশন নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে টাইপ শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হয়েছে কত কম বয়সে। সুযোগ-সন্ধান

করে কমপিউটার ট্রেনিং নিয়েছি, চাকরিতে ঢুকেছি আর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলেই বদলেছি। এইভাবে বার পাঁচেক চাকরি বদলে তবে আজ একটা মাথা উঁচু করে বলার মতো জায়গায় কাজ করছি।'

দোতলার দরদালানে চামচিকে। অন্ধভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এই বুঝি মুখে-চোখে এসে পড়ে। পাশের লোকটার হাত থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চামচিকেটাকে তাক করতে করতে আমি ব'লে চলি: কিন্তু এখানেও থেমে থাকিনি আমি। কাজ দেখিয়ে ম্যানেজমেন্টকে খুশি করেছি আব একের পর এক প্রমোশনের পরীক্ষায় পাশ ক'রে ক'রে তবে······'

দড়াম্। আমার লাঠিব সশব্দ আঘাতে দেয়ালে পিষ্ট হয়ে ভূপাতিত হয় চামচিকেটা। সেটাকে জুতোর ডগে সরিয়ে দিতে দিতে আমি আমার কথার খেই ধরি: 'আসলে কুঁড়েমিতেই শেষ করলো জাতটাকে। আর আড্ডা। পলিটিক্স। আন্দোলন।—একেবারে ওয়ার্থলেস।'

ওয়াক্ ওয়াক্।—হড়হড় বমি করছে একজন। দুর্গন্ধটা কি এতই তীব্র? কিন্তু কই আমি তো পাচ্ছি না মোটেও। আশ্চর্য তো!

ওপরে প্রথম ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। ভয়ে ভয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলি আমি। নাঃ, এ ঘরেও লাশ নেই। রাস্তার দিকের জানালার এক পাটি ভেঙে মেঝেয় গড়াচ্ছে আর সেই ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসছে বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ। উদ্দাম ঝড় উঠেছে বাইরে।

'দেখুন তো এটা কী?'

—জল থৈ থৈ মেঝেয় আবর্জনার সঙ্গে ভাসছিল কিছু। সেটা কুড়িয়ে একজন আমার হাতে তুলে দেয়। টর্চের আলোয় দেখি একটা ডায়েরি। পাতাগুলো জলে ভিজে লেপ্টে গেছে। ভেতরের লেখা ধুয়ে মুছে গেলেও মলাটটা দেখে চিনতে পারি আমি। যখন

কলেজে পড়তাম তখনকার ডায়েরি এটা। কত কী যে লিখতাম এতে! কোন্ পাড়ায় কোন্ কোন্ বাড়িতে কলেরা ভ্যাক্সিন দেওয়া হল, রিলিফ বিলোনো হ'ল, কাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হ'ল কার কাছে কত চাঁদা উঠলো—এমনি হাজারো ফিরিস্তি!

ডায়েরিটা দেখতে দেখতেই কেমন যেন আনমনা হয়ে যাই আমি। সত্যি, বেশ ছিল তখন জীবনটা। ফুটন্ত ফুলের মতন তাজা! দিনরাত ছুটোছুটি ব্যস্ততা হৈ চৈ। গ্রামের দিকে মড়ক লেগেছে,—দলবল নিয়ে দৌড়োও গ্রামে। বস্তিতে টিউবওয়েল বা জলের লাইন দরকার,—সদলে ধাওয়া কর মিউনিসিপ্যালিটির অফিস। পাড়ার রাস্তায় মাটি দিতে হবে? পানা পুকুরটা সাফ করতে হবে?—পাড়ার ছেলেদের নিয়ে লেগে যাও রবিবারে।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো ওল্টাচ্ছি, আমার হাতে কেউ তুলে দিল লম্বা এক টুকবো কাপড়—শতচ্ছিন্ন, বিবর্ণ।

'এটা ফেলে রেখে গেছেন?'—সে বলে।

'হ্যাঁ নতুন বাড়িতে জঞ্জাল আর ঢোকাতে চাইনি।'

'জঞ্জাল……?'—কথাটা শেষ না করেই সে সরে যায়। কাপড়টা মেলে ধ'রেই চিনতে পারি আমি। লেখা মুছে গেলেও চেনা যায় ব্যানারটা। এটাকে সামনে ধ'রেই তো ছাত্রজীবনে খাদ্যের দাবিতে মিছিল করেছি আমরা, খরা-বন্যা কিম্বা এমনি দুর্যোগের সময় এই কাপড়টা মেলে ধ'রে পাড়ায় পাড়ায় তুলেছি চাঁদা, চাল চিঁড়ে আটা, জামাকাপড়।

শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলি আমি। কেমন যেন আনমনা লাগছে। দীর্ঘ দিন পর নিজের বাড়িতে ফিরলে বোধ হয় এমনিই লাগে। নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে।

কিন্তু এত বছর, এতকাল এসব চোখে পড়েনি কেন আমার?

কোথায় লুকিয়ে ছিল এগুলো ?

পাশের ঘর ঠেলে খোলবার সময় আমি যেন গন্ধের কথা ভুলে চাইছিলাম এরকম আরো কিছু চোখে পড়ুক। পড়লোও। একটা ছেঁড়া বই, মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বইখানা দীপক আমায় উপহার দিয়েছিল। দীপকই প্রথম আমায় ভিয়েতনামের কাহিনী শোনায়। টর্চের আলোয় বইখানার পাতা ওল্টাই আমি। মনীষীদের ছবি : নেতাজী, আব্রাহাম লিঙ্কন, চে গুয়েভারা, লেনিন। —দীপক বলেছিল এই ছবিগুলো কোনদিন বিবর্ণ হয় না।

—সেই দীপক কোথায় হারিয়ে গেল। কলেজ ছাড়ার পরেও যোগাযোগ রাখতো ও। আমিই চাকরি-বাকরি ঘর সংসারে জড়িয়ে ছিটকে পড়লাম। শুনি মধ্য বয়সেই শরীর ভেঙেছে দীপকের, তবু এখনো বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খুলে বিনা পয়সায় পড়ায়।

তন্ময় হয়ে বইখানা দেখছি, কেউ বললো, 'অনেক কিছুই তো ফেলে রেখে গেছেন দেখছি।'

লোকটার টর্চের আলো দরদালানের প্রান্তে ছাদে ওঠার সিঁড়ির নীচে। ওখানে একটা পিসবোর্ডের ড্রাম। ইউনিসেফ্ শব্দটা এখান থেকেও পড়া যাচ্ছে। যেন দেখাও যাচ্ছে একটা উলঙ্গ শিশুর হাসিমুখ। প্রায় দৌড়ে আমি ড্রামটার কাছে যাই। উন্মত্তের মত ভেতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করতে থাকি জিনিষপত্র। গন্ধের কথা, লাশের কথা, এমনকি লোকগুলোর কথা—কিছুই আমার খেয়াল থাকে না। ওরা যখন ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আমি তখন ড্রাম থেকে তুলে আনছি শুকনো রঙ তুলি বিবর্ণ ট্রফি, পুরণো চিঠির বাণ্ডিল, হোমিওপ্যাথী ওষুধের বাক্স। ক্রমশঃ নীচে, আরো নীচে হাত নামাই আমি। উঠে আসে ভাঙা লাটাই, লাট্টু, আঠার শিশি, একটা কার্ড। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের কার্ডে যে আমারই

নাম লেখা! কার্ডটা দেখতে দেখতে বুকে চেপে ধরি। সার্টে ঘ'ষে ঘ'ষে ধুলো প'রিষ্কার করি। ভাবলে অবাক লাগে বিয়ের পরেও আমি এরকম কার্ড বছরে দুটো-তিনটে ক'রে পেয়েছি!

শব্দ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি আমি। সত্যি, জীবনের এত বৈচিত্র্য এত প্রাণ থাকতেও মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? কেন মানুষ নিজেকে বোকার মত মেরে ফেলে দুর্গন্ধ ছড়ায়?

চিলে-কোঠার সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ। ও হে, মৃত্যুকে না খুঁজে জীবনকে দেখো।—আমি মনে মনে বলি। আর ড্রামের তলা থেকে তুলে নিই একটা বাইনোকুলার—আমার শৈশবের খেলনা। অন্যমনস্কভাবে সেটা উল্টো ক'রেই চোখের ওপর ধ'রে আমি ছাদের সিঁড়ির দিকে তাকাই।

'ইস্-স্ স্……।'—সিঁড়ির ওপরে কার আওয়াজ!

'ইস্ স্স্……।'—সাপের হিস্হিসানির মত শব্দগুলো যেন আমার কানে লাগে বুকে বেঁধে। আমি ভয় পাই। আমার হাতে এই সময়ে বাইনোকুলার দেখে কি ওরা বিদ্রূপ করছে? নাকি দুর্গন্ধ মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে?

'কী হ'ল? দেখতে পেলেন?' আমি জিগ্যেস করি।

'হ্যাঁ অনেকক্ষণ। কিন্তু আমার দেখে আর কী হবে?'

ওরা বলে, 'কার লাশ?'

—ওরা নিরুত্তর। ধুপধাপ আওয়াজ তুলে নীচে নামতে থাকে শুধু।

'বলুন কার লাশ? কিসের দুর্গন্ধ?'—আমি কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করি। ওরা এখনো নির্বাক। চিলে কোঠার কাছাকাছি দেয়াল খানিকটা ভাঙা। তার ফাঁকে বিদ্যুতে ফালাফালা আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে আমার সঙ্গীরা।

'বলুন-না কে মরেছে ?'—আমি অস্থির হয়ে উঠি।

'আপনিই দেখুন না।'

—সমবেত গলায় ওদের   র স্বর কেমন যেন আপ্লুত করে আমায়। বাইনোকুলারটা অন্যমনস্কভাবে উল্টো ক'রে চোখে ধরার জন্যই মনে হয় ওরা বহুদূর থেকে কথা বলছে। —যেন জীবনের ওপার থেকে হাতছানি দিচ্ছে ওরা।

খেলনাটা চোখ থেকে সরিয়ে দেখি ওরা আমার খুব কাছাকাছি এসে আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শ্যেন-দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। সে দৃষ্টিতে স্পষ্ট ঘৃণা—শুধু ঘৃণা। আমার খুব ভয় করে। কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করি, 'কে আত্মহত্যা করেছে ?—জগন্নাথ ?'

'না।'—ওদের সমস্বর গম্ভীর জবাব।

'তাহলে—ভোলা-দা ?'

'না।'

'তাহলে কে ?—অপর্ণা ?'

'না।'—ভয়ঙ্কর নাটকীয় আওয়াজের ঐকতানে ওরা বলে, 'জগন্নাথ, ভোলা, অপর্ণা—এরা কখনো আত্মহত্যা করে না। জীবন ভ'র মৃত্যুকে পায়ে দ'লেই এদের বাঁচার চেষ্টা।'

এ কেমন ওদের গলার স্বর ? আতঙ্কে দিশাহারা বোধ করি আমি। জড়ানো স্বরে জিগ্যেস করি, 'তাহলে ? কে ? কে মরেছে ? ·····কিসের দুর্গন্ধ ?—বলুন-না প্লীজ··· ··।'

'আপনারই তো আগে জানার কথা'—আবার ওরা নাটকীয় ভাবে বলে, 'জানার কথা কে এখানে খুন হয়েছে,—খুন !'

ওদের কথা শেষ হতেই ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আগুনের হল্কা নেমে আসে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ে আমার হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

'খুন ?' অতি কষ্টে উচ্চারণ করি আমি।

'হ্যাঁ, খুন-ই তো।' বলতে বলতেই ওরা আমার আরো কাছে— আমার নিঃশ্বাসের মধ্যে এগিয়ে আসে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করি ওদের মুখের কাপড় চাপা তো নেই! কখন খুললো? আর তাই বিদ্যুৎ-চেরা কালো আকাশের প্রেক্ষাপটে ওদের ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে যেন মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা স্রোত। ত্রাসে কাঁপতে কাঁপতে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার সার্টের আড়ালে প্যান্টের পকেটে রাখা রিভলভারের কথাটা আমার খেয়াল থাকে না। আমি সেই রক্তদানের কার্ডটাই দু-হাতের মধ্যে নিয়ে জোড়হাত ক'রে বলি, 'বিশ্বাস করুন আমি জানি না কে খুন হয়েছে। বিশ্বাস করুন আমি খুনী নই।'

হোঃ হোঃ ক'রে বিকট শব্দে হেসে ওঠে ওরা। আমার খুব কাছ ঘেঁষে ওরা একটা দুর্ভেদ্য ব্যূহ হয়ে দাঁড়িয়ে। বারংবার বিদ্যুৎ-চমকে ওদের খোলা মুখে দ্রুত আলো-আঁধারের কনট্রাস্ট। আফ্রিকার আদিম উপজাতির মতই ভয়ঙ্কর বুঝি ওরা! আজ সন্ধ্যায় টি. ভি. প্রোগ্রামে দেখা উন্মত্ত নাচের মত লোকগুলো কি আমায় ঘিরে এবার নাচতে শুরু করবে? আর তার পরেই তো আগুনে ঝলসে নিয়ে·········

গুড় গুড় গুড়ুম্। আবার বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছিটকে সরে যাই। ব্যূহ থেকে বেরিয়ে ছাদের সিঁড়িতে। কিন্তু সিঁড়িতে যে আমার পা এগোয় না। যেন সেঁটে গেছে কংক্রীটে। আসলে আমার মন চায় না ঐ নিহত মানুষটাকে দেখতে। সে যদি কোন নিকট জন হয়? সে যদি দীপক হয়!

উদভ্রান্তি গ্রাস করে আমায়। এদিকে ওরা যে আমার ঠিক পিছনে। হাতে ওদের লাঠি। ওরা কি আমায় মেরে ফেলবে?

কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই—ফোটা ফুলের মতই পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে চাই যে আমি !

'লাশটা চিনতে পারছেন ?' ওদের গলায় অলৌকিক সুর বিদ্রূপের মত বেঁধে, আমায় বশীভূত করে।

আরো কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙলেই চিলে কোঠা। লাশটা কি অনেক ভেতরে ? কিন্তু এগিয়ে যেতে ভয় হয় আমার। আমি আচ্ছন্নভাবে আবার বাইনোকুলারটাই চোখে লাগাই।

ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ক্রমাগত ঠিকরে-পড়া বিদ্যুতে ঝলসে উঠছে ঘর, কিন্তু লাশ যে এখনো দেখতে পাই না আমি।

'দে-খ তে পা-চ্ছি-না।' টেনে টেনে প্রাণপণে উচ্চারণ করি, আমি।

'সাদা চোখে দেখুন, এইবার।'

আমি বাইনোকুলারটা চোখ থেকে সরাতেই ওরা সবগুলো টর্চের আলো ফেলে একসাথে—ঠিক আমার চোখের ওপরে।

চোখ বুজে যায় আমার। তীব্র আলোর মুখোমুখি স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে আসে। কিন্তু এ কী হ'ল আমার ? এত স্পষ্ট তো কখনো দেখিনি আগে !…… এতদিন কি আমি অন্ধ হয়ে ছিলাম ?……

আঃ শান্তি শান্তি ! আমার চারপাশের দেয়ালগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আর আমাকে দুর্গন্ধ খুঁজে লাশ খুঁজে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু………কিন্তু………হা ঈশ্বর, তোমারও তো পুনর্জন্ম হয়েছিল !……………

সেই অলৌকিক রাত্তিরে আমার দু'চোখ ভিজিয়ে যখন জল গড়াচ্ছে, আমি তখন হাত বাড়াচ্ছি আমার সঙ্গীদের দিকে।

ভি আই পি ও পূর্বপুরুষ

'জন জীবন বিপর্যস্ত।'—এই শিরোনামেই ব্যারিষ্টার খাস্তগীরের চিঠিটা কাগজে বেবোল। অবিশ্যি পাড়ার সব লোকের জীবন-ই যে অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল তা নয়। বাছা বাছা কিছু বিশিষ্ট লোকের পেছনে লেগেছিল সে। ডক্টর সাঁইএর গাড়ির বনেটে উঠে প্রথম সে দাপা-দাপি শুরু করে। তারপর ডাক্তারের কাঁধে চড়ে গলা থেকে স্টেথো খুলে নিয়ে পালায়। ডক্টর সাঁই-এর পাশের বাড়িটা প্রফেসার চৌধুরীর। কালো ফ্রেমের ইনটেলেকচুয়াল চশমা চোখে প্রফেসার সোসিওলজীর মোটা মোটা কেতাব পড়েন। হনুমানটা সোজা প্রফেসারের স্টাডিতে ঢুকে চশমাটি নিয়ে পিটটান দেয়। মিলিওনেযার শিল্পপতি চমনলাল চামাবিযাব পেল্লায় তেবজা বাড়ি। বাড়িব উঠোনে অনেক গাছ। তাবই একটায় বসে অনেকক্ষণ লেজ ছুলিয়েছে হনুমানটা। হঠাৎ তডবড়িয়ে নেমে এসে চামারিয়ার কাছা ধরে টেনে খুলে দেয়। তারপর তাঁর মাথা থেকে খদ্দরেব টুপিটা খুলে নিয়ে সোজা উঠে পড়ে জাম গাছে।

ব্যাবিষ্টাব খাস্তগীরের কেসটা তো আরও অপমানজনক। চুরুট খেতে খেতে মোটা মোটা আইনের বইয়ের পাতা ওল্টানো ওঁর নিত্যদিনের কাজ। হনুমানটা একলাফে গাছ থেকে নেমে খাস্তগীরের

চুরুট কেড়ে নিয়ে কেটে পড়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্যারিষ্টার হাঁ,—মুখ দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ওদিকে তাঁরই তিন তলার ছাদের আলসেয় ব'সে পায়ের ওপর পা তুলে গম্ভীর মুখে চুরুট চিবোতে চিবোতে উকুন বাছছে হনুমানটা—এ দৃশ্য দেখে যত আমোদ-গেঁড়ে লোক হেসে কুটি কুটি। এর পরে কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি না লিখে পারে?

সুতরাং চিঠি বেরোল এবং নোটবুক আর টেপ-রেকর্ডার হাতে এসে হাজির হলেন রিপোর্টার।

'হনুমান তো গাছের মাথায় থাকে কলাগাছের মাথা খায়।'—ব্যারিষ্টারের বারান্দায় বসে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নেড়ে রিপোর্টার বললেন, 'কিন্তু সে সব ছেড়ে হঠাৎ সমাজের মাথায় আই মীন, ভি আই পি-দের মাথায় চড়াও হ'ল—এর পেছনে কোন পলিটিক্যাল মোটিভ আন্দাজ করছেন কি আপনারা?'

'পলিটিক্যাল মোটিভ'?—মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন খাস্তগীর, চৌধুরী, সাঁই আর চামারিয়া। রিপোর্টারের ক্ষুরধার বুদ্ধি, খবর চুলচেরা কাটাকুটি করে, কেটেকুটে মশলা মাখিয়ে মুখরোচক খবর বানায়, তাই একেবারে হনুমানের পেছন ধ'রে টান দিয়েছে।

'বোঝেনই তো, স্যাবোটেজ চলছে দেশের আনাচে-কানাচে।' রিপোর্টার ডটপেন চিবিয়ে বিষয়টা বিশ্লেষণ করলেন। 'এই দেখুন-না আসাম, পাঞ্জাব, বিহার, উগ্রপন্থীরা কিরকম এ্যাকটিভ, পশ্চিমবঙ্গে ও তো চাপা উত্তেজনা লেগেই আছে। সুতরাং হনুমানকে বাইরে দেখা গেলেও তার নেপথ্যে থাকতে পারে কোন উগ্রপন্থী তৎপরতা। সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমাদের এডিটার সংবাদটা এ্যানালিসিস করতে চাইছেন।'

হাঁ হয়ে শুনছেন সমবেত ভি আই পি-রা। সত্যি, খবরের

কাগজের লোক না হলে ঘটনার এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারে কেউ ?

ভি. আই. পিদের হাঁ করা মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে রিপোর্টার বললেন, আমাদের কি মনে হয় জানেন ? নেক্সট সেনচুরিতে লাফ দেওয়ার জন্যে প্রধান মন্ত্রীর যে কর্মসূচী তা বানচাল করতে চাইছে হয়তো লাফ দেওয়া হনুমানটা। সুতরাং আপনাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আফটাব অল ইনটেলিজেন্সিয়ার ওপরে নির্ভর করে দেশের উন্নতির অনেকখানি। সেই ইনটেলিজেন্সিয়ার অপমান তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আমরা স্পেশাল বক্স ক'রে প্রথম পাতায় খবরটা ছাপবো।'

পরদিন কাগজে বক্স ক'রেই খবরটা ছাপা হলো। হেড লাইন হলো 'বীর হনুমানের তাণ্ডব'। হেডলাইনটা কিন্তু পছন্দ হ'ল না ব্যারিস্টার খাস্তগীরের। হনুমানকে বীরের মর্যাদা দেওয়া ! ব্যাপারটা রীতিমত হাস্যকর। এই নিয়ে ছাদ থেকে কথা বললেন ডক্টর সাঁই-এর সঙ্গে। টেলিফোনে চামারিয়া আর প্রফেসার চৌধুরীর সঙ্গেও আলোচনা করলেন। 'বাংলা কাগজগুলো এই রকম নির্বোধ-ই হয়'—ব'লে স্টেটস্‌ম্যানে দীর্ঘ আর্টিক্ল লিখতে বসলেন প্রফেসার।

এদিকে হনুমানটার অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। রোজ সকালে ছাদে উঠে একটু ফ্রী-হ্যাণ্ড ব্যায়াম করা চামারিয়ার অভ্যাস। ভুঁড়ি কমানোর জন্যে। কিন্তু ব্যায়াম শুরু করলেই কোত্থেকে হনুমানটা এসে হাজির হয় আর সমানে ডন্ টানে। ডক্টর সাঁই দোতলার গ্রীল বারান্দায় বসে বরাবর দাড়ি কামান, আজকাল সেটিও বন্ধ করতে হয়েছে। কারণ মুখে সাবান ঘষা শুরু করা মাত্র কোত্থেকে হনুমানটা লাফ দিয়ে এসে পড়ে আর সমানে ভেংচি কাটে।

প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে যাবার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক থেকে গাড়ি এসেছিল। মডেল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার উপর একটা সেমিনারে লেকচার দেওয়ার জন্যে প্রফেসার রেফারেন্স বইপত্তর নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হুপহুপ শব্দে হনুমানটা লাফ দিয়ে নামলো কোত্থেকে—নেমে প্রফেসারের গালে চুমো খেয়ে এক ভলিউম থিওরী অব ইভলিউশন নিয়ে তেঁতুল গাছে উঠে পড়লো।

ভি আই পিদের সময় এমনিতেই খুব কম। হনুমানের খবরটা কাগজে বেরোনোর পর ব্যারিষ্টার খাস্তগীর একটু আশ্বস্ত হয়ে সস্ত্রীক সিনেমায় যাচ্ছিলেন। কাছেই সিনেমা হল, জ্যামের ভয়ে আর গাড়ি বার করেন নি। স্ত্রীর হাত ধ'রে হাঁটছিলেন, কোত্থেকে হুপহুপ আওয়াজ দিয়ে হনুমানটা এসে হাজির। থতমত খেয়ে ব্যারিষ্টার স্ত্রীকে ছেড়ে চুরুট সামলাতে ব্যস্ত, ব্যস্, হনুমানটা ওঁর স্ত্রীর হাত ধ'রে পেছনের দু পায়ে খানিক হেঁটে নিল।

জরুরী মিটিং বসলো খাস্তগীরের ড্রইংরুমে। অপমানে রাগে লাল হয়ে উঠেছেন ভি আই পি-রা। হনুমানটা যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওটাকে সায়েস্তা করতে কী করা যায়?

পুলিশে খবর দেওয়ার কথা তুললেন ডক্টর সাঁই।

'আ-ধূর!—পুলিশ!'—ব্যারিষ্টার খাস্তগীর নাক সিঁটকোলেন, 'পুলিশে খবর আমি আমার চুরুট কেড়ে নেওয়ার পরই দিয়েছিলাম, কিস্যু হয়নি।'

'এখন যে বৌ কেড়ে নিল!'—বলেই অপ্রস্তুতভাবে হেসে চামারিয়া দু-হাত কপালে ঠেকালেন: 'জয় হনুমান'!

চামারিয়ার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে ব্যারিষ্টার বললেন, 'বউ কেড়ে নেওয়া, আই মীন, ওয়াইফ্ স্ন্যাচিং একে বলে না, শুধু পাশাপাশি

হেঁটেছিল একটু। তবু আমি কেস করবোই ভেবে রেখেছি।'

'হনুমানের এগেন্‌স্টে কোর্ট-কেস ?'—প্রফেসার চোধুরী অবাক।

'আ-ধুর! হনুমানের এগেন্‌স্টে কেন ?'—ব্যারিষ্টার ধমকে উঠলেন। 'ঐ হনুমান পুলিশের এগেন্‌স্টে। হনুমানের উপদ্রবের কথা তোলায় বলে কিনা হনুমান ধরা পুলিশের কাজ নয়। আরে বাবা, আমি হাই কোর্টের বাঘা ব্যারিষ্টার, কোন্‌টা কার কাজ আমি জানি না ?'

'এগ্‌জ্যাক্টলী।'—বললেন ডক্টর সাঁই।

'ইয়েস।'—কথার খেই ধরলেন ব্যারিষ্টার।

পুলিশকে হনুমান ধরতে তো আমি বলিনি। আমি বলেছি ভি' আই পিদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে—যে-ইকরুক অত্যাচার তো বটে, যাকে বলে কিনা সোস্যাল নুইসেন্স—এর এগেন্‌স্টে স্টেপ নেওয়া কি পুলিশের উচিত ছিল না ?'

সবাই সায় দিলেন এই কথায়। প্রসঙ্গতঃ মিলিটারি শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুললেন কেউ কেউ।

খাস্তগীর বললেন, 'ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডে যখন বিধান রয়েছে, তখন পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে স্যুট ফাইল আমি করবই। কিন্তু আপাততঃ হনুমানের উপদ্রব কী ভাবে ঠেকানো যায় ?'

'আপাততঃ ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া যেতে পারে'। প্রস্তাব দিলেন ডক্টর সাঁই।

'ঠিক বাত্‌। দমকল।'—বলে খালি মাথাটা ওপর নীচে দোলালেন চামারিয়া। হনুমানে টুপি কেড়ে নেওয়ার পর থেকে মাথা-জোড়া টাক আর টিকি খোলাই থাকে।

প্রফেসার চৌধুরী এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন। 'দমকলে খবর দিন, তবে তাতে বিশেষ কাজ হবে বলে

মনে হয় না। আপনারা ডারউইন পড়েছেন কিনা জানি না, তবে এটা হ'লো গ্রেট-গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদারের ব্যাপার।'

'গ্র্যাণ্ডফাদার!'—অবাক হলেন ব্যারিষ্টার। 'হনুমানের মধ্যে আবার গ্র্যাণ্ডফাদার আসছে কোত্থেকে?'

'আসছে আসছে।'—চোখ ছোট করে প্রফেসার বললেন। 'আসলে ওটা হনুমান নয়।'

'হনুমান নয়?' —ভি আই পিদের চোখ ছানাবড়া, মুখে কথাটি নেই। হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন প্রফেসারের মুখের দিকে।

'ইয়েস হনুমানের মুখ পোড়া লেজ লম্বা।' প্রফেসার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

'হাঁ হাঁ ঠিক বাত্'—ব'লে কথা কেটে দিলেন চামারিয়া। 'লেজের আগুনে লঙ্কা পোড়াতে গিয়েই তো মুখ পুড়লো।'

'ওটা মিথলজি।'—প্রফেসার গম্ভীর ভাবে বললেন, কিন্তু সে যাই হোক, ভি আই পিদের পেছনে লেগেছে যেটা সেটা হনুমান নয়—বাঁদর, সোস্যাল সায়েন্সে যাকে বলে মানুষের এ্যানসেষ্টার অর্থাৎ পূর্বপুরুষ!

'পূর্বপুরুষ'! আঁতকে উঠে প্রফেসারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ভি আই পিরা।

'এগ্জ্যাক্টলী। বাঁদর হ'ল মানুষের পূর্বপুরুষ! আর এই হাইপথিসিস থেকে এক্ষেত্রে যে ইনফ্যারেন্সটা বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য ভাবে উঠে আসছে তা হলো, এই উকুন-বাছা, গাছ থেকে লাফ দিয়ে নামা বাঁদরটা হ'ল মানুষের পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি।

'প্রতিনিধি?'—ভি আই পিরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রফেসারের মুখে।

'হ্যাঁ প্রতিনিধি।'—প্রফেসার বিষয়টা বিশ্লেষণ ক'রে চললেন,

'আর এ যুগে মানুষের প্রতিনিধি বলতে তো এ্যারিষ্টোক্র্যাট অর্থাৎ এই আমাদের মত ভি আই পিরাই—এতে আর সন্দেহ কী? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, মানুষের পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি আসছে মানুষের বর্তমান প্রতিনিধিদের কাছে। ব্যাপারটা সীরিয়াস।

সমবেত ভি আই পিদের চোখে সরষে ফুল। মুখ হাঁ। প্রফেসার বিদগ্ধ পণ্ডিত। কাগজের রিপোর্টার যেমনটি বলেছিলেন ঠিক সেইমত বাঁদরের একেবারে পেছন ধরে টান দিয়েছেন।

এখন কথা হলো, আমাদের পূর্বপুরুষ কেন আমাদের কাছে আসেন?'—প্রফেসার ছাত্র পড়ানোর কায়দায় বক্তৃতার জের টেনে চললেন 'পিণ্ড নেবার জন্যে তো? কিন্তু মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা পিণ্ড নিতে এলেও জীবিত পূর্বপুরুষ সশরীরে কী চাইতে আসছেন সেটাই আমাদের ভাবতে হবে।'

'এগজ্যাক্টলী।'—সোৎসাহে সমর্থন জানালেন ভি আই পিরা। কিন্তু পূর্বপুরুষ কী চাইতে আসতে পারেন?'—জ্ঞান কালচার প্রতিপত্তি নাকি এ্যারিস্টোক্র্যাসী?—ভি আই পিরা সবই দিতে পারেন কিন্তু এসব নেওয়ার ক্ষমতা তো বাঁদরটার নেই। তাহলে?

এ ভাবে অনেক ভাবনা চিন্তা অনেক আলোচনা করেও বাঁদরটা ঠিক কী চায় কিছুতেই সঠিক বুঝে ওঠা গেল না। তখন ভি আই পিরা প্রত্যেকে নিজের নিজের বাড়ির ছাদে সাজিয়ে রাখলেন কলার কাঁদি, আম, জাম বেগুন, দুধ, ক্ষীর সন্দেশ এমন কি আধুনিক পূর্বপুরুষের সম্ভাব্য রুচিপরিবর্তনের কথা ভেবে চিকেন স্যাণ্ডুইচ, মাটন ষ্টু্য এগ রোল পর্যন্ত রেখে এলেন। কিন্তু হা হতোস্মি। বাঁদরটা সেসব কিছুই ছুঁলো না। ছাদে ব্যারিষ্টারের কালো কোট শুকোচ্ছিল সেটা নিল, ডক্টর সাঁই-এর টাই, চামারিয়ার পৈতো আর কপালে তিলক কাটার চন্দন কাঠ, প্রফেসারের নোটের ফাইল—যেখানে যা

পেল সব নিয়ে তেঁতুল গাছের মগ-ডালে উঠে পড়লো।

শুধু তাই নয়! রাস্তার ওপরে পাবলিক লাইব্রেরী। তার ছাদের আলসেয় বাঁদরটাকে দেখা গেল সাত-সকালে। গলায় ডক্টর সাঁইয়ের স্টেথো আর টাই, তার ওপরে ব্যারিষ্টার খাস্তগীরের কোট, চোখে প্রফেসারের চশমা, মাথায় খদ্দরের টুপি, কপালে তিলক কাটা বাঁদর। তার তলপেটের কাছে ঝুলছে চামারিয়ার পৈতেটা, ডান হাতে প্রফেসারের সোস্যাল ইভলিউশন থিওরি, বাঁ হাতে চুরুট টানছে। সে এক অভাবিত দৃশ্য। দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল। গাড়ির পর গাড়ি—ট্রাফিক জ্যাম। যত আমোদ-গেঁড়ে লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে আর মজা দেখছে।

ভি আই পিদের খাওয়া গেল। ঘুম গেল। চিঠির পর চিঠি। টেলিফোনের পর টেলিফোন। রিপোর্টারের পর রিপোর্টার। আবার জরুরী মিটিং বসলো প্রফেসারের স্টাডিতে।

এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে সোসিওলজির পাহাড়ের মধ্যে প্রফেসার। চোখের নীচে কালি।

টেবিলের পাশে রাখা দূরবীনটা দেখিয়ে বললেন, 'এ কদিন আমি টেলিস্কোপে কনস্ট্যান্ট্লি ওয়াচ করেছি পূর্বপুরুষকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঁদরটা একটা সিম্বল—আই মীন প্রতীক।'

প্রতীক?—অবাক হয়ে প্রফেসারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন খাস্তগীর, সাঁই আর চামারিয়া।

'আলবৎ প্রতীক। নইলে সোস্যাল ইভলিউশনের থিওরিটাই মিথ্যে হয়ে যায়; ভাবছি আমার ডি. এস. সির জন্যে নেক্সট্ থিসিসে ব্যাপারটাকে প্লেস করবো।'

'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার!'

'ব্যাপার আর কিছুই নয়। সেদিন রিপোর্টার যে পলিটিক্যাল

মোটিভের কথা বলছিল মনে আছে তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেই মোটিভই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি সবাই।'

'হ্যাঁ মোটিভ। মোটিভ আমি পেয়েছি।'—প্রফেসার মৃদু হাসলেন।—'হাজার হাজার বছরের বিবর্তিত বাঁদর—আই মীন পূর্বপুরুষ—আজ হয়েছে আক্ষরিক অর্থেই মাস্ অর্থাৎ জন-সাধারণ।'

'এ্যাঁ ?'—চমকে উঠলেন উপস্থিত ভি আই পিরা।

'এই যে আপামর মূর্খ বুবাক হাঘরে হাভাতে পাবলিক এদেরই আলঙ্কারিক প্রতিনিধি হচ্ছে এই বাঁদরটা।'

'তাই তো!'—হাঁ হয়ে শুনছেন ভি আই পিরা।

হ্যাঁ, দেখছেন না, বাঁদরটা পেছনে লেগেছে শুধু ভি আই পিদের। অর্ডিনারি পাবলিক কিন্তু দিব্যি বাজার যাচ্ছে, চ্যাঁরশ কিনছে, হাতে লাউ শাক ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছে, কলে কারখানায় হাতুড়ি পিটছে, আপিসে কেরানি-গিরি করছে, দিন মজুরি করছে—এদের কারোকে নিয়ে বাঁদরটার মাথা ব্যাথা আছে ?'

'নাঃ, যত বাঁদরামি ভি আই পিদের ওপর। পাবলিকে তো স্রেফ মজা দেখছে। উসকেও দিচ্ছে বোধ হয় বাঁদরটাকে।'

'ঠিক ধরেছেন।'—প্রফেসার বক্তৃতার খেই ধরলেন। 'এই উস্কে দেওয়াটাই হ'ল আসল মোটিভ। উস্কে দিয়ে দেশের আনাচে কানাচে ডিসটারব্যান্স ক্রীয়েট করাই হ'লো মাস্‌এর ক্যারেক্টার। চার পাশে যে এত দাঙ্গা, অগ্নি সংযোগ, মিছিল মিটিং-বন্ধ—সর্বত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এই মাস্ অর্থাৎ বুর্বাক জন-সাধারণ। এরা হিংসে করে আমাদের। পেছনে লেগে উত্যক্ত ক'রে মারে। পূর্বপুরুষ এদেরই প্রতিনিধি।

ইমিজিয়েটলি বাঁদরটাকে গুলি ক'রে মারা উচিত।'

ব্র্যাভো ব্র্যাভো। টেবিল চাপড়ে সাবাস জানালেন সবাই। এমার্জেন্সি ভিত্তিতে পার্লামেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি থেকে পাঠানো হলো ওস্তাদ শিকারী। সঙ্গে এল, ইনটেলিজেন্সের লোক, দূরদর্শনের ক্যামেরাম্যান। রীতিমত জাতীয় বিপর্যয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আজকাল উগ্রপন্থী কীর্তি কলাপে।

আসলে স্টেটস্‌ম্যানে প্রফেসার চৌধুরীর দীর্ঘ অটিক্ল বেরোনোর পর থেকেই ডিফেন্স মিনিস্ট্রি তৎপর হয়ে উঠেছিল। এগাব জন এম. পির সঙ্গে চামারিয়ার যোগাযোগ। তাঁদের মধ্যে জন তিনেক তো পার্লামেন্টের সেশন শেষ হলেই চামারিয়ার বাগান বাড়িতে আসেন বিশ্রাম নিতে। তাঁদের মারফৎ পার্লামেন্ট পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিলেন পূর্বপুরুষ।

সুতরাং সাজসাজ রব পড়ে গেল তল্লাটে। অটোমেটিক রাইফেলে পয়েন্ট থ্রি-নট্-থ্রি বুলেট ভ'রে হেলমেট মাথায় পশ এলাকায় টহল দিতে লাগলো শিকারী। চামারিয়ার চার তলার ছাদে টি. ভি. ক্যামেরায় টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ক্যামেরাম্যানরা। ব্যারিষ্টার খাস্তগীরের ড্রইং-রুমে নোটবুক আর ডট্ পেন হাতে বসে রইল রিপোর্টাররা। দিনের পর দিন খবরের কাগজে বেরোতে লাগলো এই সমাজ-বিরোধী জাতীয়তা বিরোধী তৎপরতার ফলাও বিবরণ। মাস মুভমেন্টের সঙ্গে তুলনা ক'রে সম্পাদকীয় বেরোতে লাগলো একের পর এক।

বাঁদরটাকে কিন্তু আর দেখা গেল না। টি. ভি. স্ক্রীনে সমানে ফুটে উঠতে লাগলেন পশ এলাকার এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট আর ইনটেলিজেনসিয়া—যাবতীয় ভি আই পি। বাঁদরটা কিন্তু হাওয়া।

রাস্তা ঘাটে বাজারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে শুধু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে বুর্বাক পাবলিকে।

রাজধানী ইতিমধ্যে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। হবে না কেন? রিপোর্টার এডিটার, দূরদর্শন আর সি বি আই—এর লোক, মায় অনেক এম. পি. পর্যন্ত বাঘা বাঘা ভি. আই পিরা এখন কলকাতায়। মাস্ মুভমেন্ট-এর আশঙ্কায় মিনিস্ট্রাররা পর্যন্ত পার্লামেন্টের বাইরে বিশেষ বেরোচ্ছেন না। দেশে এমার্জেন্সি জারী করার প্রস্তাবও তুলছেন কেউ কেউ।

সেই ফাঁকে পূর্বপুরুষ সোজা এসে উঠলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের মাথায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের চুড়োয় খোশ মেজাজে বসে আছে বাঁদবটা। চশমা থেকে ওভার কোট পর্যন্ত বেশবাস পূর্ববৎ। নতুনের মধ্যে শুধু প্রফেসার চৌধুরীর সেই দূরবীনটা—যেটা চোখে লাগিয়ে গোটা দেশের যাবতীয় ভি আই পির ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ নজর রাখা যায়।

পেসমেকার

আমি মৃত্যুপথযাত্রী এক বেকার যুবক। হৃদযন্ত্রের অসুখে আমি দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী এবং ডাক্তারদের অভিমত হলো, অবিলম্বে আমার বুকে পেসমেকার বসাতে না পারলে আমার অকাল মৃত্যু অনিবার্য। এই যন্ত্র বসানোর ন্যূণতম খরচ ষোল হাজার টাকার মত—যার অর্ধেক সংগ্রহ করাও আমার মত বেকার যুবক কিম্বা আমার বৃদ্ধ পিতার পক্ষে অসম্ভব। সহৃদয় দেশবাসী ও বিভিন্ন জনহিত কর প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার বিনীত আবেদন আপনারা সাধ্যমত সাহায্য করে আমার জীবন বাঁচান।

মন্মথ সান্ন্যাল

৬বি অর্ধেন্দু পালিত সেকেণ্ড বাইলেন,

কলকাতা।

সন্ধ্যায় খবরের কাগজ খুলে চিঠিটা আবার পড়লো মন্মথ। এই নিয়ে বোধ হয় বার ছয়েক হলো। নিজেরই লেখা চিঠি, তবু বারবার পড়া। হ্যাঁ, ঠিকই আছে।—মন্মথ একটা সিগারেট টেবিলের ওপর হাতের তালু দিয়ে রোল্ করতে করতে ভাবলো খাসা হয়েছে চিঠির বয়ান। সাহিত্যের ভাষায় যাকে কিনা বেশ হৃদয়গ্রাহী বলা যায় তাই। জনগনের তো পাষাণ হৃদয়, সেই পাষাণ গলিয়ে

করুনা ঝরাতে এরকম চিঠিরই দরকার। চার লাখের ওপর বিক্রি কাগজটা। তার মানে রোজ অন্তত: দশ লাখ লোক এই কাগজটা পড়ে। মন্মথ সিগারেটটা রোল্ করে মসলা বার করতে করতে অঙ্কটা হিসেব করে ফেলে। এই দশ লাখের সিকি ভাগের চোখেও যদি চিঠিটা পড়ে, তার মানে আড়াই লাখ। হিসেবের সুবিধের জন্যে অঙ্কটা কাটছাঁট করে ধরা গেল দু-লাখ। এই দু-লাখের শতকরা মাত্র একজন ও যদি করুনায় গদ্গদ হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তা হলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় দু-হাজার। খুব কম করে ধরলে গড়ে প্রত্যেকে পাঁচটা করে টাকা পাঠালেই পাঁচ দুগুনে দশ হাজার। ছোটখাট একটা কারবার এই পুঁজিতে দিব্যি শুরু করা যাবে।

হাসলো মন্মথ। ফাঁপা সিগারেটটায় গাঁজা ভরলো। তারপর ধরিয়ে টানতে লাগলো।

ব্যোম্ ব্যোম্। তাহলে মন্মথ সান্ন্যাল; তোমার কর্মজীবন নব উদ্যমে শুরু হতে চলেছে এবার। ডজন খানেক এক্সপেরিমেণ্ট ফ্লপ করার পর এই হলো শেষ ফুটো নৌকো—জীবন সমুদ্র পার হওয়ার শেষ খেয়া। বলে কিনা প্রতারনা! জালিয়াতি! শ্লা জ্ঞানবৃদ্ধ সিদ্ধপীর!—মন্মথ দশ আঙুলের মধ্যে গাঁজাভরা সিগারেটটা ধরে কষে টান দেয়। আসলে বেচুটা আর বেকার নেই তো। তাই এত জ্ঞান! তাই এত র‍্যালা! আরে বাবা তোর দৌড় তো জানা আছে। পলিটিক্যাল খেউড় গেয়ে প্রাইমারি মাষ্টার। তাতেই এত বড় বড় লেকচার? 'লেখাপড়া শিখে এরকম জঘন্য হতে পারলি মন্মথ? তোর শুভবুদ্ধি নিয়ে, তোর মূল্যবোধ নিয়ে এত বড় জুয়া খেলছিস তুই?'

হ্যাঁ, খেলছিই তো জুয়া। ব্যোম্ ব্যোম্। পুরো সমাজটাই তো জুয়ার বোর্ড হয়ে আছে রে-শালা। মূল্যবোধ কি ধুয়ে ধুয়ে

খাবো ? দেড় মাস পরে বাপ রিটায়ার করলে দুটো ধাড়ি বোন সমেত পাঁচটা পেটে খাবার জোটাবো কি শুভবুদ্ধি রেঁধে রেঁধে ?

থুঃ। জানালা গলিয়ে থুথুর সঙ্গে নিভে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে দেয় মন্মথ থুঃ থুঃ চারপাশে সবটাই তো দগদগে ঘা, পচে গলে বিষাক্ত হয়ে আছে। সেখানে আবার মূল্যবোধ, শুভবুদ্ধি থুঃ। অনেক দেখছি মাই ডিয়ার দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর থেকে এই একটা যুগ তো আর ঘুমিয়ে কাটাইনি। ওসব মূল্যবোধটোধ হলো কেতাবী কথা, ওসব লেকচারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে পাবলিক বেশ ক্ল্যাপ-টল্যাপ দেয়। আসলে সবাই জানে ফাঁকা আওয়াজ। আসল কথাটা হলো টাকা, পরিভাষায় মানি—সুইটার দ্যান হানি। টাকা মানেই আরো টাকা রমরমা—সল্ট লেকে ফ্ল্যাট ফ্রীজ, স্কুটার, কালার টি. ভি. টেলিফোন হ্যালো মিস্টার সান্যাল স্পীকিং………। আর টাকা যদি নেই তো পায়ের তলায় দুনিয়ার মাটিও নেই। সরে পড়, স্রেফ সরে পড় এ দুনিয়া থেকে। ঘুমের বড়ি, হাওড়া ব্রিজের তলায় গঙ্গা, রেলের লাইন ভবপারে যাওয়ার পথ বিস্তর।

কিন্তু ব্রাদার, হে জ্ঞানতপস্বী বেচারাম, হে পলিটিক্যাল লীডারের পা চাটা কুত্তা, একটা কথা মনে রেখ, শেষ না দেখে মন্মথ সান্যাল এ দুনিয়ার মাটি থেকে পা ওঠাবে না।

এবার একটা বিড়িতে গাঁজা ভরে মন্মথ ধরিয়ে কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়াটা গিলে খানিক বুঁদ হয়ে ব'সে থাকে। তারপর কাশে। কাশতে কাশতে লালচে চোখগুলো বড় বড় হয়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে। বুকের মধ্যে ধোঁয়ার সঙ্গে ধাক্কা দেয় অচিন্ত্যের কথাগুলো। 'আমাদের বন্ধু হয়ে এত নীচে নামতে পারলি তুই ? নামাত নামতে এতদূরে !'

নিচে নামা! থুঃ।—জানালা গলিয়ে থুথু ছুঁড়ে দিয়ে মন্মথ বিড়বিড় করে।—ওপরে ওঠার সুযোগ থাকলে কেউ নিচে নামতে চায়? সকাল নটায় স্নান খাওয়া সেরে মুখে পানটি গুঁজে সিগারেটটি ধরিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে বেরোনোর সুযোগ পেলে কেউ হেরোইনের চোরাবাজারে গিয়ে পুলিসের তাড়া খায়? মদ কেনাবেচার দালালি করে? নাকি কবরখানা থেকে টুম্বস্টোন চুরি করে বিক্রির ঝুঁকি নেয়?

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মাই ডিয়ার অচিন্ত্য। তোমার মত মেসোর সোর্সে ঝুনঝুন ওয়ালার পা চেটে চারশ টাকার কলমবাজিটা মেরে দিতে পারিনি—এই তো আমার উইকনেস? কিন্তু সোজা পথে হাঁটার কম চেষ্টা তো করিনি মাই ডিয়ার। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর টাইপ শিখেছি, টেলক্সের কাজ শিখেছি। তারপর বছর দুয়েক চাকরির দরখাস্ত আর ইন্টারভিউর একঘেয়ে বোলে রিহার্স্যাল দেওয়ার পরে স্টেজে নেমেছিলাম। এক গুজরাটী ফার্মে দেড়শ টাকায় দৈনিক দশ ঘন্টার গোলামি দিয়ে শুরু। তারা কম্পিউটার বসিয়ে পাছায় লাথি মারার পর টুং-টাং টুং-টাং সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে কাগজের হকারি। তারপর কম্পিটিশনে ছিটকে গিয়ে নাগরওয়াল মারোয়াড়ির রং কারখানার অফিসে কালো টাকাকে সাদা করার হিসেব রেখেছি আড়াইশ টাকায়। চার বছর পর আচমকা নাগরওয়াল ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার পর অর্ডার সাপ্লাই। গোটা পাঁচেক ছোট বড় পার্টি টাকা মেরে দেওয়ার পর বাড়ি ভাড়ার দালালি। এরই ফাঁকে ব্যাঙ্কে চাকরির প্যানেলে নাম উঠেছিল একবার। ঠাণ্ডাঘরে বোধ হয় জমে গেল সেই নাম। তারপরে একদিন দরখাস্ত পাঠাতে গিয়ে দেখলাম চাকরির আর বয়েস নেই।

সুতরাং হে জ্ঞান-তপস্বী মগ্নপ্রাণ বন্ধুগণ, আমাকে আর জ্ঞান

দিও না। চাকরি পাওয়ার বয়েস পেরিয়ে যাওয়ার পর যখন জমি কেনাবেচার ব্রোকারি করার কথা বললাম, তোমরা বললে পুঁজি চাই। ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বেশ্যার দালালি করবো বললাম, তোমরা বললে আগে বেশ্যাবাড়ি ঘুরে আসা চাই। তখন ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার কথা তুললাম। তোমরা বললে শেলটার চাই। তাহলে? রেলের বুকিং অফিসে রিজার্ভেশন চোরাই ক'রে কিংবা পুজোর চাঁদার ডুপ্লিকেট বিল গছিয়ে তো বেঁচে থাকার একটা পার্মানেণ্ট ব্যবস্থা হয় না ডিয়ার। তাহলে?

খুক খুক কাশির আওয়াজে মন্মথর তন্ময়তা ভাঙে। বাবা কাশছে। মাত্র দেড় মাস পর বাবাও হয়ে যাবে বেকার। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির ভেলামাত্র ভরসা করে উত্তাল সমুদ্র কি ভাবে পাড়ি দেওয়া যাবে ভেবে দেখছে কি কোন জ্ঞান তপস্বী মহাপ্রাণ···? তাই এই শেষ চেষ্টা। জীবন সমুদ্র পার হওয়ার শেষ ফুটো নৌকো। শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে মন্মথ। খবরের কাগজটার ওপর চোখ রাখে। হাজার পাঁচেক টাকা এলেই শুরু করা যাবে কোনরকম একটা ব্যবসা। বড় রাস্তার মোড়ে জগৎগু তেওয়ারির পাশে একটা ঘুপচি ঠিক করাই আছে। সেলামীটা দিয়েই সাজিয়ে বসবে টুকিটাকি স্টেশনারী জিনিস বিস্কুট সাবান কাগজ পাতা চা। তারপরে একটু দাঁড়িয়ে গেলে·········।

এখন শুধু অপেক্ষা—এ চিঠির কেমন সাড়া আসে তার জন্যে।

সপ্তাহ খানেকের ভেতরেই মানি অর্ডারে টাকা আসতে শুরু হয়। কেউ পাঁচ, কেউ দশ, কেউ পঁচিশ, কেউ আবার ভাঙাচোরা। যেমন সাড়ে সাত টাকা, এমন কি ছু-টাকা পঁচিশ পয়সা পর্যন্ত। প্রথম সপ্তাহে মন্মথর আয় হয় তিন হাজার টাকা। দ্বিতীয় সপ্তাহে চার হাজার। মানি অর্ডারগুলো সই করে নিতে নিতে কুপনের

ছোট ছোট চিঠিগুলোর ওপর চোখ বোলায় মন্মথ। যেমন কোন ভদ্রলোক লিখেছেন ঃ

প্রিয়বরেষু,

খবরের কাগজে আপনার দুর্ভাগ্যের বিবরণ পড়ে আমার এক-দিনের বেতন পাঠালাম। আশাকরি জনগণের সহায়তায় আপনার পেসমেকার বসানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সম্ভব হলে চিঠি দিয়ে বিস্তারিত জানাবেন। ইতি।'

কিংবা কোন গৃহবধূর লেখা ঃ

অচেনা ভাইটি,

আমাদের সাধ আছে, সাধ্য নাই, তাই সামান্য এই কটি টাকা পাঠালাম। যদি এবার বেশী শীত না পড়ে তাহলে গরম জামা-কাপড়ের খরচ কিছুটা বাঁচিয়ে আরও কিছু টাকা পাঠাবো। কেমন থাকেন অবশ্যই জানাবেন। ইতি—দূরের এক বৌদি।

এমন কি কোন বাচ্চা ছেলের চিঠি ঃ

শ্রীচরণেষু কাকু,

খবরের কাগজে আপনার চিঠি পড়ে আমার টিফিন খরচ বাঁচিয়ে সামান্য এই টাকা পাঠালুম। আশাকরি আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। বাপি আর মা-কেও আপনার কথা বলেছি। ওরাও পাঠাবে। আমি ক্লাস সেভ্নে পড়ি। সামনে পরীক্ষা। ইতি—প্রনতঃ—রজত মল্লিক।

অথবা কোন বৃদ্ধের লেখা ঃ

স্নেহের দাদুভাই,

আমার এক নাতি বিদেশে থাকে! তাহার কথা স্মরণ করিয়া সামান্য সাহায্য পাঠাইলাম। আশাকরি ভগবৎ কৃপায় তুমি অচিরেই আরোগ্য হইবে এবং তোমার বেকারিত্বও ঘুচিবে। মনে রাখিও

তোমাদের মত যুবশক্তির কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করে। ইতি—শ্রীশিবকৃষ্ণ সেনগুপ্ত।

পোষ্ট অফিস থেকে ঘরে ফিরে মানি অর্ডার কুপনগুলো পড়তে মন্মথকে বেশ কয়েকটা গাঁজার বিড়ি টানতে হয়। অচেনা ভাইটি, শ্রীচরণেষু স্নেহের দাদুভাই—ব্যোম্ ব্যোম্। কাগজে বেরিয়ে চিঠিখানা তাহলে সহৃদয় জনগণের সেন্টিমেণ্টে বেশ সুড়সুড়ি দিয়েছে বলতে হয়। নইলে এত টাকা হিসেবের অনেক বেশি টাকা আসে কী করে? বেকার ছেলের বুকে পেসমেকার বসিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে কোমর বেঁধে লেগেছে সবাই, অথচ ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার একটা সোজা রাস্তা বাৎলে দেয়নি কেউ। অর্থাৎ বেঁচো এবং অসৎ হও এই হলো সমাজের মর্মবাণী! ব্যোম্ ব্যোম্। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন্মথ। কাশতে কাশতে ওর চোখে জল এসে যায়।

এদিকে ওর বাবা বিনয়েন্দ্র জানতেন না কিছুই। ভদ্রলোক ব্যাঙ্ক আর চিটফাণ্ডের কাগজপত্র চেন-কাটা ফোলিও ব্যাগে ভরে যথারীতি সওয়া নটার ট্রাম ধরবার জন্যে দৌড়োচ্ছিলেন। একদিন পাড়ার লোক পথ আটকে ছেলের অসুখের কথা শুধোতেই বিনয়েন্দ্র ফিল্মের ফ্রীজ-শট এর মত স্থাণু হয়ে গেলেন রাস্তায়। ফিরে এলেন বাড়ি। কাঁপতে কাঁপতে মন্মথকে বললেন, 'আজই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি তুই।······অনেক সহ্য করেছি এতদিন। আর নয়।··· আমার ছেলে হয়ে কিনা এত বড় ক্রাইম তুই করতে পারলি?'

'ক্রাইম? ওয়াগন ভাঙা কিংবা ডাকাতির চাইতে কিন্তু অনেক ভাল।' মন্মথর জবাব।

'না না।' চিৎকার করলেন বিনয়েন্দ্র।—'আরো খারাপ। অনেক অনেক বেশি জঘন্য অপরাধ করেছিস তুই। মানুষের মানবিকতা নিয়ে পাশায় দান ধরেছিস। ইটস্ এ থ্রেট টু হিউম্যানিটি

এ গ্রেইট্ থ্রেট্ অন্ হিউম্যান রিলেশন শিপ। এটুকু বুঝিস্ না যে, এটা জানাজানি হওয়ার অর্থই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনে মানুষ আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভরসা পাবে না। চিকিৎসার অভাবে একমাত্র সন্তানকে হারাবে তার মা-বাপ, সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষটা সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নেবে পৃথিবী থেকে—কেন না কেউ তাকে বিশ্বাস করে সাহায্যের হাত এগিয়ে দেবে না।'

মন্মথ চুপ। যেন থাপ্পড় খেয়েছে মুখে। বেচু পরামর্শ দেয় মানি অর্ডারে আসা টাকাগুলো ফেরৎ দিতে। কিন্তু জানাজানি আটকানো যাবে না তাতে ও, প্রতারণার ব্যাপার সবাই জেনে যাবে।—বিশ্লেষন করে দেখায় অচিন্ত্য।

মন্মথর বাবা খবরের কাগজের সম্পাদককে পুরো ব্যাপারটা লিখে চিঠি দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। বেচু আর অচিন্ত্য বাধা দেয়। কারণ ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এ ভাবে পূরণ করতে যাওয়াটা হবে বোকামী। বিনয়েন্দ্র তখন পুলিশকে জানানোর কথা তোলেন। মন্মথ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এলোমেলো ঘুরতে থাকে পুরনো আড্ডায়। হেদুয়ার পাড়ে। মিঞাবাগান বস্তিতে। মল্লিক বাজারের গোরস্থানের আশেপাশে।

আর ফিল্মের স্টক্ কাট্ এর মত ছবিগুলো ওর মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। বৃদ্ধ বিনয়েন্দ্রের শীর্ণ মুখ, কুঞ্চিত ভ্রূ, ঝাপসা চশমা. একটি দীর্ঘশ্বাস·········পুলিশের হাতকড়া, থানার লক-আপ, উকিলের গলা চেরা চিৎকারঃ ইওর অনার, ইটস্ আ থ্রেট্ টু হিউম্যানিটি, আ ক্রাইম আণ্ডার সাব-সেকশন সি অব সেকশন ·········আণ্ডার ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড। ·········প্রকাণ্ড মালা গলায় এক রাজনৈতিক নেতার মুখ—কখনো বেচু, কখনো

অচিন্ত্য—আমাদের এই মহান দেশের মহান যুবশক্তির নৈতিক মূল্যবোধের কাছে জাতির প্রত্যাশা ....।

হে আমাদের নৈতিকতা আর মূল্যবোধের সদাজাগ্রত মহান প্রহরীবৃন্দ—মন্মথ ব্রাউন সুগারের নেশায় বুঁদ হয়ে ভাবে।—আমি তো শালা একটা বেকার বাঁদর, মহাপাতকের কাজ করে জাহান্নামে গেছি। কিন্তু আর সবাই?...... ওহো ওহো, কী চমৎকার নৈতিকতা আর মূল্যবোধ বিরাজ করছে সমাজে। বাচ্চার বেবিফুডে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল। ইনজেকসন দেওয়ামাত্র ডুবার মাটি কামড়ে হাত-পা ছুঁড়েই ফুটিতে গুড়! ওহো মানবিকতা! ওহো শুভবুদ্ধি! ওহো ওহো! প্রকাশ্য রাস্তায় তরুণী ধর্ষন আর ছিনতাই, অফিসে সবার চোখের সামনে ঢালাও ঘুষের কারবার। বাঘা বাঘা লোকে প্ল্যান করে ব্রিজ বানাচ্ছে, ব্যারেজ, বছর না ঘুরতেই ধুপধাপ ভেঙে ভেসে যাচ্ছে জলে। ওহো! ঘুষ না দিলে চাকরি হয় না। জাল সার্টিফিকেট, জাল মার্কশীট কিনতে পাওয়া যায় বাজারে। তাই নিয়ে মামা-কাকা-মেসো, পাতানো মেসো, মন্ত্রী-এম.এল.এ-কে ধরো,—দু হাজার পাঁচ হাজার ঢুকিয়ে দাও ইন দ্য পকেট অব্ দ্য রেসপেকটেড এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার—অফিসের মহান ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে খানা পিনা করা আমিনিয়ায় আর তারপর...... আচ্ছা, বাবাজীবনের বেতন কত?—বেতনের কথা আর কেন শুধোচ্ছেন, সেটা তো সবটাই ব্যাঙ্কে জমে, সংসার চলে তো উপরিতে... .....বেশ বেশ...... ..তারপর মোজেক করা দোতলা বাড়ি......কালার টি. ভি......ফ্রীজ, বাজাজ স্কুটার.........

গাঁজার বিড়িতে আবার আগুন জ্বালে মন্মথ। আর ব্যবসা? কালোবাজারি মজুতদারী—এসব তো পুরনো কথা। সামান্য পুঁজির একটা চা-বিস্কুটের দোকান—ঐ মোড়ের জগ্‌গু তেওয়ারী—সাত

বছর হয়নি, ওখানে এখন হোটেল চলছে রমরম করে……কী না মেলে ওর হোটেলে ?……বিদেশী ক্যামেরা টেপ রেকর্ডার, ঘড়ি, মদ, এমন কি মেয়েমানুষ পর্যন্ত।

হায়রে মূল্যবোধ। হায়রে আমার ব্রিটিশ আমলের ভীমরতি-বান বাপ। নৈতিকতা তোমরা পুষে রাখো মগজে। মন্মথ মহা-পাতককে আর ঐ সব সেন্টিমেন্টাল সুড়সুড়ি দিও না। চারপাশে এত নৈতিকতার রথী-মহারথী থাকতে শুধু এই মহাপাতক মন্মথর জন্যই আটকে যাচ্ছে সবকিছু ? পেসমেকার বসানোর এই অত্যা-ধুনিক ধাপ্পাটা দেখে তোমরা আমায় খরচের খাতায় লিখে ফেললে, অথচ গোটা সমাজটা যে পচা-গলা ঘায়ে ভর্তি হয়ে গেল, রক্তে যে তার বিষ, সমাজের হার্ট যে বন্ধ হওয়ার মুখে, তার পেসমেকারটি কে বসায় ?

মল্লিক বাজার গোরস্থানের আব্রাহাম বলতো যীশুর কথা। এ সমাজে নাকি যীশুর দরকার। যীশুর মত মানুষের। যীশু মানেই নেতাজী। যীশু মানেই লেনিন। আরে ইয়ার, বড় বড় বাত ঝেড়ে, তুমিই আমার হাত দিয়ে কফিন চোরাই করতে। তারপর তো ভিড়লে ছেলেচোর ছক্কুর দলে। একটা বাচ্চাকে স্কুল থেকে ফেরার পথে তুলে সটকেছিলে তোমরা। তোমাদের সাঁতরাগাছির ডেরায় হানা দিয়েছিল পুলিশ। বামাল সমেত ধরা পড়েছিল ছক্কু। পুলিসের গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল মাটিতে। সব জানি ইয়ার, সব বৃত্তান্তই জানি। ছক্কুর লাশ নিয়ে গেল পুলিস আর তুমি ফিরে এলে মল্লিক বাজার। ফিরে আসার পর গ্রেভ-ইয়ার্ডের গেটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী সাংঘাতিক কথাটা তুমি বললে ! তুমি বললে, তোমার মেয়ের পেটে নাকি আমার বাচ্চা ! ওহো ! ওহো ! তোমার সামনে তোমার মেয়েকে কান ধরে ওঠ্‌বোস করিয়ে তোমার

পাছায় লাথি কষিয়েছিলাম, মনে আছে শয়তান ? ছক্কুকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তুমি আমায় গাঁথাব মতলবে ছিলে শালা·····! তোমার মগজেও নৈতিকতাব ভেজাল, মুখে যীশুর জ্ঞান ! তবে হ্যাঁ, তোমার মেয়ের পেটে সত্যিই কোন নিমকহারাম জানোয়ারেব বাচ্চা আছে। আর মেয়েটা····মেয়েটা····।

হোটেলের বিছানায় যতক্ষণ না লুটিয়ে পড়ে মন্মথ ততক্ষণ নেশা করে। গাঁজা আর সস্তার মদ—গ্লাসেব পর গ্লাস। এলো-মেলো ভাবতে ভাবতে বমি করতে করতে এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে।

ঘুম ভাঙতেই পেসমেকার। এমন চিঠি তো কতই বেরোয় কাগজে।—মন্মথ ভাবে।—কারোর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে, কারোর লাংস অপারেশনেব জন্য লণ্ডন কিংবা নিউইয়র্ক যাওয়া দরকার, কারোর ব্রেন টিউমার কিংবা লিউকিমিয়ার চিকিৎসা করাতে হামবুর্গ যেতে হবে। এ সবই কি সত্যি ? ওরা কি মন্মথর মতই পয়সা রোজগারের ধান্ধা করে না ?

অতএব নতুন কাজ জোটে মন্মথর। লাইব্রেরী গিয়ে মাস তিনেকের যত পুরনো খবরের কাগজ ঘাঁটে। জীবন রক্ষার আবেদন গুলো পড়ে ঠিকানা টুকে নেয়। তারপর ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে গিয়ে হাজির হয়।

'আপনার ছেলের নাকি হার্ট ব্লক ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে তো গত মাসেই······।'

হাউ হাউ কান্না। মন্মথ ছিটকে চলে যায়। পরের ঠিকানায় গিয়ে কড়া নাড়ে।

'আপনার মেয়ের নাকি দুটো কিডনিই······ ?'

হ্যাঁ আপনি কি ?······'

'না মানে এমনি কাগজ দেখে জিজ্ঞেস করতে এলাম। কোন সাড়া পেয়েছেন?'

'না। টাকা দিতে এগিয়ে আসছে অনেকেই, কিন্তু টাকা আমাদের কী হবে? একমাত্র মেয়ে আমাদের, ও চলে গেলে……।'

আবার কান্না। ফোঁপানি। সেই কবরখানার আব্রাহামের মেয়ের মত গোঙানি। মন্মথর পা যেন সেঁটে যায়, উঠতে পারে না।

'ডোনার পাননি কাউকে?'

'দুজন টাকার বিনিময়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু টিস্যু মেলেনি। আমাদের দুজনের পর্যন্ত মিললো না।'—দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। 'এখন ……যত টাকাই লাগুক……পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর ……এমন কি আমাদের ফ্ল্যাটটাও যদি দিয়ে দিতে হয়, তবু দিয়ে দেব একটা কিডনির বিনিময়ে। জানেন তো একটা কিডনি দিলেও মানুষের কোন ক্ষতি হয় না?……'

ব্যাস্ আর দরকার নেই শোনার। মন্মথ ওঠে। দু সপ্তাহ ঠিকানা ধরে ধরে বাড়ি বাড়ি কড়া নেড়ে ও একটাও মিথ্যে কেস পায় না। তখন ফিল্মের স্টক শট্-এর মত আবার কিছু স্মৃতি ওর মনে উঠে এসে ধাক্কা মারে।

লিভারের মারাত্মক অসুখে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল রথীনদার দু-বছরের ছেলেকে। ঠিকমত বোধহয় দেখাশুনা হচ্ছিল না, তাই ডাক্তারকে ধোলাই দেওয়া হয়েছিল। অথচ আয়রনি এটাই যে, বাচ্চাকে অপারেশনের ভার পড়লো সেই সার্জেন-এর ওপরেই। আশা ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। যে ডাক্তার মার খেয়েছে রোগীর লোকের হাতে সে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে রোগীকে। কিন্তু দারুণ ভাল অপারেশন হয়েছিল ছেলেটার। সে এখন ক্লাস টু-তে পড়ে।

ওয়াগণ-ব্রেকার ইসমাইলকে এক রাত্তিরে খোলা রিভলভার হাতে তাড়া করেছিল দারোগা মতি বিশ্বাস। একটা জলা ডিঙিয়ে পালিয়েছিল ইসমাইল। কিন্তু কালভার্ট থেকে পিছলে জলে পড়ে মতি দারোগা। সাঁতার জানতো না। জল খেয়ে ডুবতে ভাসতে লাগলো! পিছন ফিরে ইসমাইল দেখে, জলে ত লিয়ে যেতে গোঙাচ্ছে মতি দারোগা। তখন ইসমাইলই মতি দারোগাকে জল থেকে তুলে বাঁচায়। তাহলে কি……তাহলে কি …. ।

কিন্তু কিছুতেই যে মেলানো যাচ্ছে না ছক্কুব হিসেবটা।. আব্রাহামের মুখে ছক্কুব গুলি খেয়ে মবার কথা শুনেছিল মন্মথ। কিন্তু সবটা শোনে নি। মানে ভেতরের ব্যাপারটা। স্কুলের বাচ্চাটাকে নিয়েই সাঁতরাগাছির ডেরা থেকে দৌড়ে পালাচ্ছিল ছক্কু। পালাতে পালাতেই গুলি খেয়ে মরে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে বাচ্চাটা বাঁচলো কী করে?

ভাবনার ফিল্ম মন্মথর মনের মধ্যে কেটে যায়। ব্যবসা শুরু করায় মন দেয় ও। কাঠ প্লাইউড এ্যাসবেস্টারের পর কাঁচ দিয়ে সাজায় দোকান ঘর। আর সেখানেই একদিন অচিন্ত্য আর বেচুর সঙ্গে দেখা।

'কী রে, তোর ব্যবসা কতদূর?'—বেচু শুধোয়।

'এই তো। সাজানো চলচে। দু সপ্তাহের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে—জোচ্চুরির টাকায়।'—মন্মথ হাসে। তারপর অপ্রাসঙ্গিক-ভাবেই বলে, 'হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারবি তোরা কেউ? একটা বাচ্চাকে বাঁচাতে একটা কিডনি দান কবতে পারবি? জানিস তো একটা কিডনি দিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। সবাই ভাল বলবে, আবার লাখ খানেক টাকাও পাবি এর বিনিময়ে।'

'তাহলে তুই-ই দিয়ে দে-না। ব্যবসাটাও বাড়াতে পারবি

তাহলে। মোটা পুঁজি, মোটা লাভ।'—অচিন্ত্য বিদ্রূপ করে।

'আমি দিলে আর তোদের বলবো কেন? আমি তো মহাপাতক—এ ডায়াবলিক্যাল এনিমি টু হিউম্যানিটি। কিন্তু তোরা? তোরা তো সব আদর্শবান যুবক। তাই বলছিলাম তোদের মধ্যে কেউ .... টাকা না হয় না-ই নিলি ..... যাকে বলে কিনা নিঃস্বার্থ দান ...একটা বাচ্চা মেয়ে ......বাপ মায়ের একমাত্র সন্তানের জীবন বাঁচাতে .... বন্ধু, মহলে একটু জিগ্যেস করিস তো .. ওদের ঠিকানা হচ্ছে . . ।'

চলে যায় মন্মথ। দোকানের জন্য মালপত্র কেনার যোগাযোগ করে। ওর পুঁজি এখন পনের হাজার ছুঁইছুঁই। পুঁজি পুঁজি। ক্যাপিটাল ফর ইনভেস্টমেণ্ট। হোটেলের মধ্যে নেশায় বুঁদ হয়ে মন্মথ আপন মনে বিড় বিড় করে। কারো পুঁজি বাপের টাকা, কারোর পুঁজি মামা-কাকা-মন্ত্রীর সোর্স, কারোর পুঁজি পলিটিক্যাল হিপক্রিসি। মোদ্দা কথায় বেঁচে থাকতে গেলে একটা পুঁজি চাই। সেই পুঁজি—মহামূল্য পুঁজি . . পেসমেকারের ধাপ্পা দিয়ে যা কিনা যোগাড় করা হলো তাই নিয়ে জ্ঞান দেয় শালা জ্ঞানবৃদ্ধের দল। পুঁজির জোরই তো আসল জোর। কবরখানার ভূত আব্রাহামের এই পুঁজির জোর থাকলে তাকে আর মেয়ের পেটের মধ্যে বাচ্চার কান্না শুনে মন্মথকে ব্ল্যাকমেল করতে হত না। এই পুঁজির জোর থাকলে ছক্কুকে বাচ্চা কিডন্যাপ ক'রে পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে হত না।

ছক্কু! হ্যাঁ ছক্কু কিভাবে মরলো? ছক্কু মরলো অথচ চোরাই বাচ্চাটা দিব্যি বেঁচে গেল। ব্যাপারটা কী?

মন্মথ ছুটলো গ্রেভ ইয়ার্ডে আব্রাহামের কাছে। তোমাকে বলতেই হবে যীশুর ভূত, ছক্কু কিভাবে মরলো? কান পেতে

মন্মথ শুনতে লাগলো আব্রাহামের কথা। আর শুনতে শুনতেই ওর অঙ্কটা মিলে গেল। পেছনে রাইফেল তাক করে পুলিশ আর সামনে দৌড়োচ্ছে ছক্কু। ছক্কুর পিঠে বাচ্চা। ওটাই তো রক্ষা-কবচ! পুলিস গুলি ছুঁড়তে পারবে না, ছুঁড়লে বাচ্চাটা মরে যাবে আগে। কিন্তু পেছনে গুলির আওয়াজ হতেই এক লহমায় পিছন ফিরে চেয়েছিল ছক্কু। ইস্ গুলি করছে মর্কট পুলিশ! বাচ্ছাটার লাগবে যে! হ্যাঁচকা টানে বাচ্চাকে সামনে টেনে বুকের আড়ালে বসিয়ে দিয়েছিল ছক্কু আর তারপরই গুলি। ওর মাথাটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল বুলেটে

অন্ধকার গ্রেভ-ইয়ার্ড থেকে প্রায় টলতে টলতে উঠে এল মন্মথ। অদ্ভুত এক নেশায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। আচ্ছন্ন-ভাবেই হোটেলে ফিরলো ও। সারারাত নেশা করলো। পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লো। তারপর উধাও।

অচিন্ত্য আর বেচু বেশ অবাক হয়ে গেল। রমরম করে দোকান চলছে মন্মথর, অথচ ওরই পাত্তা নেই। কোথায় গেল?—দোকানের ছেলেটি জানাল মন্মথ কলকাতার বাইরে।

মন্মথ এবং ওর পেসমেকারের গল্প কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ পর মন্মথকে আবার দেখা গেল শহরে। ধীরে ধীরে পা ফেলে ও মল্লিক বাজার গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন অন্ধকার। চারপাশ বড় নিঃঝুম। কুঁড়ের মধ্যে কুপী জ্বালিয়ে বাইরে বসেছিল আব্রাহাম—ভূতের মত। মন্মথ সোজা গিয়ে কাজের কথাটি পাড়লো।

'ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এবার বলো, তোমার মেয়ের কী গতি করবে ভাবছো?'

আব্রাহামের মনে হলো মন্মথ নেশা করে এসেছে। আশ্চর্য্য হয়ে সে বললো, 'তার মানে?'

'মানে, তোমার মেয়ের পেটে যে বাচ্চার জন্ম দিয়েছে তার হদিশ পেলে ?

'নাঃ।—ছোট্ট করে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললো আব্রাহাম। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'না। আমার ইচ্ছা।' —ধমকালো মন্মথ। 'আমি বিয়ে করবো তোমার মেয়েকে। নইলে···নইলে বাচ্চাটাকে যে······।'

তারপর অনেক নাটক। কান্না হাসি। মন্মথর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল আব্রাহামের মেয়ে। ওকে তুলে ধরে মন্মথ বললে, 'আমার সম্পর্কে দুটো সাংঘাতিক সত্যি কথা—মানে কলঙ্কের কথা—যাকে বলে কি না ডার্ক স্পট—কিন্তু স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিচ্ছি। এক—পেসমেকারের ধাপ্পাটা তো জানোই—এর জন্য বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। সুতরাং বাড়িতে আর ঠাঁই হবে না। আর দুই,—টিস্যু যদি মিলে যায়, তাহলে একটা কিডনি কিন্তু আমি দান ক'রে দেব।·····'

থামলো মন্মথ। তারপর খিস্তি দিয়ে দিয়ে—দীর্ঘক্ষণ বকবক করলো। যেন নেশার ঘোরে কথা বলছে। সারি সারি কবরের ঘন অন্ধকারের পানে চেয়ে ও বক বক করেই চললো। সমানে কাঁদছে মেয়েটা। সমানে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে আব্রাহাম। আর দুরন্ত নেশার ঝোঁকের মত কথা বলে চলেছে মন্মথ আপন মনে।

অনেক রাতে থামলো ও। চুপচাপ উঠে গিয়ে দাঁড়ালো অন্ধকার গ্রেভ-ইয়ার্ডে। চারপাশে অন্ধকার। এবং নীরবতা। আশ্চর্য এই নীরবতার মধ্যে অদ্ভুত শান্তি পাচ্ছিল মন্মথ। কালো আকাশের নীচে স্পষ্ট যেন একটা ধুকধুক ধুকধুক আওয়াজ। হয়তো ইলিউসন্। কিন্তু গভীর রাতে একা অন্ধকারে ওর স্পষ্ট মনে হতে লাগলো আশ্চর্য বিশাল একটা হৃৎপিণ্ড যেন সমানে ধুকধুক করে চলেছে চরাচর জুড়ে। কেউ তাকে থামাতে পারবে না।

রক্ত

রক্ত চাই। এক্ষণি রক্ত চাই।

—রক্তের জন্যে ক্রমশঃ উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমি। যেন দিশা-হারা। অমানবিক। বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর মাঝে আধো-অন্ধকার পথ দিয়ে আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। এলোমেলো হাঁটছি আর বারে বারে গেটের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। বাইরে দীর্ঘ রাজপথে যতদূর চোখ যায় চেয়ে চেয়ে দেখছি। কিন্তু নাঃ। লোকটার দেখা নেই। প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেল, সে কালোবাজারে রক্ত জোগাড় ক'রে দেবে ব'লে অগ্রিম টাকা নিয়ে গেল, কিন্তু এখনো তো ফিরলো না!

তাহলে কি করি?—আমি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফেললাম ফ্যাকাশে হলুদ রঙের বাড়িটার দিকে। ব্লাড ব্যাঙ্ক। মানুষের সঞ্জীবনী থাকার কথা ওখানে। কিন্তু নেই।—ও-গ্রুপের এক বোতলও নেই। অন্ততঃ ভিতরের ডাক্তারটি তো তাই বললো। নইলে আমার শরীরের বি-গ্রুপের রক্তের বদলে আমি রমার জন্য ও-গ্রুপের এক বোতল রক্ত পেতে পারতাম।

তাহলে? রক্তের জন্য এখন কাকে পাই? প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল ডেলিভারি ওয়ার্ডের নার্স আমায় তাড়াতাড়ি রক্ত আনতে বলেছে। দেরি হয়ে গেলে হয়তো রমাকে আর বাঁচানো যাবে না,

কোনদিন পৃথিবীর আলো দেখবে না আমাদের প্রথম সন্তান।

ভাবতে ভাবতেই উৎকণ্ঠায় ঘামতে থাকি আমি। মনে পড়ে বিজয়দার কথা। সহকর্মী বিজয়দার ছেলে গত বছর মোটর-সাইকেল এ্যাক্সিডেণ্টে দারুণ জখম হয়েছিল। বিজয়দা কলকাতা থেকে রক্ত আনিয়েছিলেন। চারশ টাকায় দু বোতল রক্ত এসেছিল বরফের মধ্যে। কিন্তু এই রাত্তিরে একা এক্ষণি আমি কি-বা করতে পারি? তাহলে কি রক্তের অভাবেই মারা যাবে রমা?—যেমন অলকেশ······

ফিল্মের স্টক শট্-এর মতই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে অলকেশ। আমাদের পাড়ার ছেলে। রাজনীতি করতো। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতেই গুলি খায়। এমনি এক রাত্তিরে অলকেশের হাফ্-প্যাণ্ট পরা ভাই আমাকে ডাকতে এসে-ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, 'দাদার ভীষণ চোট লেগেছে। দারুণ রক্ত পড়ছে। এক্ষণি রক্ত দিতে হবে। তাই বাবা বললেন আপনাদের খবর দিতে।'······

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই অলকেশ মারা যায়।······

ভাবনাটা আরো অস্থির ক'রে তুললো আমায়। চারপাশ খুঁজে খুঁজেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দু-একজন ডাক্তার, নার্স। এক একটা দ্বীপের মতন। যেমন ঐ মানুষগুলো। কৃষ্ণ ফুলের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। ওদের কাছে রক্তের জন্য আমি কত অনুনয় করলাম। ওরা কিন্তু নিজেদের রক্ত পরীক্ষাই করালো না। বললো ওদেরও নাকি মুমূর্ষু রোগী আছে।

তাহলে কে বাঁচাবে রমাকে? হাসপাতালে রক্ত নেই। বেড, ওষুধ-পথ্য পরিচর্যা—কিছুই যথেষ্ট নেই। নরক একটা!—ইচ্ছে করে······ইচ্ছে করে প্রকাণ্ড একটা ডিনামাইট ফাটিয়ে সবকিছু ভেঙে চুরমার ক'রে দিই। ······অলকেশরা বলতো দেশের এই

পচা-গলা ব্যবস্থাটাকে ভেঙে যতদিন না নতুন একটা সমাজ গ'ড়ে তোলা যায় ততদিন……

চারপাশে এখন এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে রোগীব আর্তনাদ, শিশুর কান্না। বাইরে কোথাও লাউড-স্পীকারে গান বাজানো শুরু হ'ল।

কিন্তু রমা!—রমা এখন কেমন আছে?—ভাবনাটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত আমার মস্তিষ্কে ধাক্কা মারে। আমি হাঁটতে থাকি দ্রুত। ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে রাস্তাটা মস্ত আউটডোর বিল্ডিং-এর করিডোর ছুঁয়ে আবার নীচু হয়ে আমায় মেটারনিটি বিল্ডিং-এর নীচ-তলায় পেঁছে দেয়। অন্ধকার এখানে আরো বেশি। এবং নীরবতা। সে নীরবতা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কুকুরের চকিত চিৎকারে।

সামনে একটা মানুষ। নতুন পাঁচতলা বাড়িটার লাগোয়া বাগান দিয়ে হেঁটে আসছে। কে ও? অলকেশ না? আধো-অন্ধকারেও চেনা যায়— সেই মুখ, সেই চেহারা, হাঁটার ভঙ্গীটাও একই।

কাছাকাছি হতেই আমরা মুখোমুখি দাঁড়াই।

'আরে পার্থদা, আপনি এখানে! কি ব্যাপার?'

'রমা……মানে আমার ওয়াইফ্-এর ডেলিভারি।' ঢোঁক গিলে কোনরকমে উচ্চারণ করি আমি, 'কিন্তু তুমি?'

'বাবার পেপটিক আলসারটাই আবার এ্যাকিউট হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারুণ রক্ত পড়ছে। এক্ষণি রক্ত দিতে হবে।'

'আমিও-তো রক্ত খুঁজছি ভাই।' বলতে বলতেই আমি ওকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। আর বেশিক্ষণ ওর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাহলেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে অলকেশ মারা

যাওয়ার পরই ওর বাবা আমাদেব পাড়া থেকে বাসা উঠিয়ে অন্যত্র চলে যান।

তাহলে? তাহলে কি অলকেশেব প্রেতাত্মা? এই ভয়ঙ্কর রাত্তিরে ও আমাকে দেখা দিল কি প্রতিশোধ নেবার জন্যে?
কিন্তু কী-ইবা করার ছিল আমাব? ছা-পোষা মানুষ আমি। গুলি খাবার পব অলকেশের যখন রক্ত দরকার তখন আমি রক্ত দিতে যাইনি। কিন্তু একজন সংসাবী মানুষ হিসেবে রাজনীতির সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ে পড়তে চাইনি আমি—এটা কি অপরাধ?

আতঙ্কে-উৎকণ্ঠায় আমি পাগলের মত দৌড়োতে থাকি। খোয়া-পাথব রক্তমাখা তুলো ব্যাণ্ডেজ পায়ে দলে তরতর ক'রে সিঁড়ি ভাঙি। কোলাপসিব্‌ল গেট ধাক্কা খাই।

'একবাব খুলুন তো দাদা। ভিতবে স্ত্রী আছে। তার জন্য বক্ত আনতে বলেছে ডাক্তাব।'

গেট্ খুলতেই আমি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি টপকাই। দোতলা। তেতলা। করিডোরে থমকে দাঁড়াই। হাঁপাই। একটা ট্রলি। কর্কশ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে।

রমা! স্ট্রেচারের মধ্যে যন্ত্রণায় বোধ হয় অজ্ঞান। চোখ বোজা। স্যালাইন বোতলটা ধ'রে আছে যে নার্সটি সে বলে 'কি হ'ল? রক্ত কই?'

'এ-এ-একটু দেরি হবে।'—কোনরকমে জবাব দিই আমি।

'দেখুন যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

ট্রলিটা আমার বুকের মধ্যে কর্কশ আওয়াজ তুলে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে যায়।

আবিষ্টভাবে খানিক বন্ধ-দরজাটার দিকে চেয়ে থাকার পর আমি সংবিৎ ফিরে পাই। হৃৎপিণ্ড যেন দ্বিগুণ লাফাতে থাকে।

আমি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙি।

নিচে রাস্তায় নামতেই একটা বিবর্ণ খয়েরী রঙের ভ্যান। মড়া বয় এতে। দুর্গন্ধ। আমি সবে দাঁড়াই। তারপরে জোরে জোরে পা ফেলি। উৎরাই ভেঙে নামতে নামতে দেখি শিশু বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অলকেশ।

'কী হল?'—অলকেশ জিগ্যেস করে।

রক্ত পাইনি।'—সংক্ষিপ্ত জবাব দিই আমি।

কোন্ গ্রুপ?'

'ও'।

'ও-গ্রুপের রক্ত পাওয়াই বেশি মুশকিল। ও-গ্রুপের রক্ত সবাইকেই দেওয়া যায় তো—।

অসহ্য। অসহ্য লাগছে আমার এই কাকতালীয় যোগাযোগ। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সংকটের সময় দেখা দিয়েছে অলকেশ। রমাকে ও কিছুতেই বাঁচতে দেবে না!—আমি ওকে পাশ কাটিয়ে পিছলে পালাই।

একটু এগিয়ে পিছন ফিরে দেখি অলকেশ আমার দিক চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ওর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে রাস্তায়। ছায়া পড়ছে যখন, তখন কি প্রেত নয়?
সত্যিই রক্ত-মাংসের অলকেশ। কিন্তু ও তো শুনেছিলাম গুলি খাওয়ার পর রক্তের অভাবেই মারা যায়!—নাকি ওরা এরকমই? কৈ মাছের প্রাণ! কিছুতেই মরে না!

তাহলে তো অলকেশকেই রক্তের জন্য বললে হ'ত। ওদের অসাধ্য তো কিছু নেই। আমাদের পাড়ায় থাকতে কালোবাজারি আর মজুতদারি বন্ধ ক'রে দিয়েছিল ওরা। মাত্র একদিন প্রচার ক'রে এলাকার সমস্ত চটকলে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করিয়েছিল। কাঁচ

কারখানাটা লক আউট করলে পুরো কারখানাই ওরা শ্রমিকদের দখলে এনেছিল।

কোথায় হারিয়ে গেল ওরা!

কোথা গেল অলকেশ? নিজের থেকেই অলকেশ আমার সঙ্গে বারে বারে কথা বলেছে অথচ ওকে আমি এড়িয়ে গেছি। হা ঈশ্বর, কেন আমি অলকেশকে রক্ত জোগাড় ক'রে দিতে বললাম না? ফিমেল ওয়ার্ড, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের বারান্দা পেরিয়ে পৌঁছোই ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে। ভিতরে টেবিলে মাথা নামানো নির্লিপ্ত ডাক্তার আর বাইরে বারান্দায় ঝুল কালি মাখা বিবর্ণ বাল্ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে আমি হাসপাতালের গেটে আসি। বাইরে বেরোই। যতদূর চোখ যায় চেয়ে চেয়ে দেখি। অলকেশ নেই। সেই লোকটাও নেই। রাস্তায় স্কুটার, মোটরকার। গাড়িতে হাসিখুশি মানুষ। ওপাশে বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। ব্যালকনিতে ঠাণ্ডা পানীয় হাতে সুবেশ নারী-পুরুষ। কেউ কেউ সিগারেট টানছে। উদাস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে এই হাসপাতালটার দিকে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে।

ছিঃ। এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ঘৃণা জেগে উঠেছে আমার তৃপ্ত শূকরের মত সুখী সুখী মানুষের ওপর। লাউডস্পীকারের গানটা উৎকটভাবে আমার বুকে এসে বিঁধছে, হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ……

অলকেশ কোথায় গেল? মেইল মেডিক্যালের বারান্দায় ছুটোছুটি করছে কুকুরগুলো। ওদের ভিতর দিয়ে দৌড়ে এগোতেই সামনে দেখি অলকেশ। ইমারজেন্সির সামনে আলোকিত করিডর দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছে। ওর হাতে একটা বোতল।

প্রাণপণ দৌড়ে আমি অলকেশের কাছে যাই। ও ততক্ষণে

ওয়ার্ডমাস্টারের অফিসের অন্ধকার উঠোনে পেঁছে গেছে।

'রক্ত পেলে?'

'না। এটা স্যালাইন ওয়াটার।'

ততক্ষণে খপ্ করে আমি অলকেশের হাত ধরে ফেলেছি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোঁক গিলে থুথু খেয়ে বলি, 'কী হবে ভাই? রক্ত যে পাচ্ছিনা কোথাও! অথচ রমাকে ও, টি, তে নিয়ে গেল।……'

আমারও তো সেই সমস্যা! বাবার বি, গ্রুপের রক্ত দরকার, —পাচ্ছি না। নিজে এক বোতল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। বন্ধুদের খবর দেওয়ারও সময় পাইনি।'

'রমার গ্রুপ যে ও। নইলে তো আমিই দিতে পারতাম। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ না- ভাই। নইলে নইলে……'

বলতে বলতেই আমি বাষ্পরুদ্ধ হই।

অলকেশ বলে, 'ঠিক আছে। আমি নার্সিং হোমগুলোতে দেখছি। ও-গ্রুপের পেলে নিশ্চই এনে দেব। আপনি ততক্ষণ আউটডোরের করিডরটায় দেখুন তো টাকার বিনিময়ে রক্ত দেবে এমন কাউকে পান কি না।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না আমি। জিগ্যেস করি, 'তার মানে?'

'মানে কিছু গরিব মানুষ টাকা নিয়ে নিজের রক্ত দেয়।—' অলকেশ বুঝিয়ে দেয়।—'হাসপাতাল থেকে যত রোগী রক্ত নিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরে তা দর শতকরা নব্বই জনের শরীরেই বইছে এরকম গরীব মানুষের রক্ত।'

গরীব মানুষের রক্ত!!—অলকেশ চলে গেলে হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকি আমি। মানুষের জীবন সমাজ সভ্যতা—সবেরই প্রাণশক্তি-টুকু আসে কি গরীব মানুষের রক্ত থেকে?……

লাউডস্পীকারের সেই বিকট গানটা আবার আমার কানে

আসে। বুকে বেঁধে। হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ……।
ভয় করছে আমার। ভয়! প্রচণ্ড ভয়!

উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমি আবার চড়াই ভাঙি। আউটডোরের অন্ধকার বিশাল করিডর দিয়ে কুকুরগুলোকে পাশ কাটিয়ে দৌড়োতে থাকি। এবং হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

রক্ত চাই?'

—একটা মানুষ। ধড়মড় ক'রে উঠেই সে জিগ্যেস করে, 'রক্ত চাই - রক্ত?'

অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সবচেয়ে কাঙ্খিত প্রশ্ন সেটাই।

'হ্যাঁ, ও-গ্রুপের।'—আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিই।

'আমার ও-গ্রুপ। চলুন।'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটে। ম্লান আলোয় ওকে ভালো ক'রে দেখি এবার। পরনে ছেঁড়া রঙচটা লুঙি, গেঞ্জি আর চাদর। রুক্ষ শীর্ণ চেহারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কোটরাগত চোখ।—প্রেতের মত বিভৎস!—স্পষ্টতঃই গরীব মানুষ।

'একশ' টাকা লাগবে কিন্তু।'—সে হাই তুলে বলে।

'হ্যাঁ দেব'।

এক বোতল রক্তের জন্যে একশ' টাকা কেন, এই মুহূর্তে সর্বস্ব খোয়াতেও আমি রাজি আছি।

কার অসুখ?'—লোকটা জিগ্যেস করে।

'স্ত্রীর।—ডেলিভারি।'

লোকটা আর কথা বলে না। ব্লাড ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় শয্যা নেয়।

'হবে না, হবে না, এই ওঠ্‌ ওঠ্‌।'—ব্যস্তভাবে ডাক্তার ব'লেন 'গত সপ্তাহেই রক্ত দিয়েছিস, তুই, এখন আর রক্ত নেওয়া যাবে না।'

হতবুদ্ধি আমি। পরক্ষণেই বলি, 'কি বলছেন আপনি? এর রক্ত পেলে তবে আমার পেসেণ্ট বাঁচবে।'

কিন্তু একে মেরে ফেলে তো আপনি রক্ত পেতে পারেন না। গত সপ্তাহেই দেখেছি এর মিনিমাম ওয়েট্ ছিল না। রক্ত বার করলে লোকটা অসুখে পড়বে।'

'পড়ুক অসুখে। সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। আমি প্রায় চিৎকার ক'রে উঠি, 'আমি টাকা দিয়ে রক্ত কিনছি এর কাছে, আপনি বার করুন।'

উত্তেজনায় আমি তখন কাঁপছি। প্রৌঢ় ডাক্তার আর বেশিক্ষণ তর্ক করলে আমি নিশ্চিৎ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ঘুসি মারতাম। ডাক্তার আমার মুখে নির্বাক চেয়ে থাকেন। তারপর লোকটাকে কলের পুতুলের মত পরীক্ষা ক'রে ওর হাতের শিরায় সুঁচ ফোটাতে ফোটাতে বলেন, 'রক্ত কিন্তু কেনা বেচার জিনিস নয় ভাই। রক্ত অমূল্য, আর তা শুধু দান আর গ্রহণই করা যায়।'

আমি আর কথা বলি না। অপলক চেয়ে চেয়ে দেখি লোকটা কেমন হাতের মুঠোয় ধরা কাঠের টুকরোর মত জিনিসটা টিপে টিপে শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত নিংড়ে দিচ্ছে। টুলে বসানো বড় বোতলটা ক্রমশঃ ভ'রে উঠছে ঘন লাল রক্তপ্রবাহে।······ রক্ত মানেই জীবন। জীবন মানেই সংগ্রাম।·· ·ভিয়েতনাম··· এল সালভাদোর ·· আফ্রিকা ·· ভারতবর্ষ।··তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।···স্বাধীনতার জন্যেই রক্ত ঝরায় শহীদেরা।···অলকেশরাও লড়ে স্বাধীনতার জন্যে। বলে, মানুষ জন্মায় স্বাধীন, বাঁচে পরাধীন। অলকেশ বেঁচে আছে এখনো! আমি ওর হাতে হাত দিয়ে দেখেছি ও জীবন্ত মানুষ!! হ্যাঁ ওরা ভাঙুক। ভেঙে তছনছ ক'রে দিক এই পচা গলা জঘন্য ব্যবস্থাটাকে।

আরে অলকেশ না ?—দেখতে পাচ্ছি হাসপাতালের মেন গেট দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে।

'কী ব্যাপার ?'

'নার্সিং হোমগুলো দেখে এলাম।'

'রক্ত পাওনি ?'

'না। পাইনি এখনো। আপনি কাউকে পাননি ?'

হ্যাঁ একজনকে পেয়েছি। ভেতরে সে রক্ত দিচ্ছে। ভাগ্যিস তুমি সন্ধান দিয়েছিলে।'

বলতে বলতেই অলকেশের দু হাত নিজের দু হাতের মধ্যে ধরি আমি। আবেগে কাঁপছে গলা আমি বলি, 'তোমরাই, হ্যাঁ তোমরাই পার এই জঘন্য সোসাল সিস্টেমটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে যেখানে মানুষ ..'

'কিন্তু রক্ত দানের প্রয়োজনটা কি তাহলেই ফুরিয়ে যাবে ?'—গম্ভীর স্বরে আমার কথা কেটে দেয় অলকেশ। যেন চড মারে আমার মুখে। বুকে গুলি খেয়ে অলকেশ যখন রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল তখন আমি ওকে রক্ত দিইনি—সেই কথাই কি এখন ও আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে ?

'হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না-কিছু করার আছে।'—আমি মাথা নামিয়ে বলি, 'তোমরা যদি সামনে থাকো অলকেশ...'

'আমি অলকেশ নই, পুলকেশ। দাদা তো সেই কত বছর আগে মারা গেছে রক্তের অভাবে।'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যায়।

স্তব্ধ হয়ে যাই আমি। চারপাশ মনে হয় আরও স্তব্ধ। রোগীর আর্তনাদ, কুকুরের চিৎকার কিংবা লাউডস্পীকারের বিকট আওয়াজ—কিছুই আর শোনা যাচ্ছে না। রক্তের অভাবে মারা গেছে অলকেশ। আমরা কেউ ওকে রক্ত দিইনি। কোনদিনই আমি কাউকে রক্ত দিইনি। অলকেশের মত মানুষকে বাঁচাতেও না।

লোকটা উঠে টাকা নিয়ে চলে গেলে আমি পুলকেশের কথা ভাবি। অলকেশের প্রতি যে অপরাধ করেছি আমি পুলকেশের পাশে দাঁড়িয়ে তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্তও কি করতে পারি না? পুলকেশের বাবার জন্যে বি গ্রুপের রক্ত দরকার। আমার গ্রুপও তো বি!

'এই যে রক্তটা নিন'।

—ডাক্তারের কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি হাত বাড়ালাম। এবং বোতলটা হাতে পেয়েই সম্মোহিতের মত হাঁটতে লাগলাম। চড়াই ভেঙে উঠতে গিয়েই দেখি পুলকেশ।

পুলকেশকে দেখেই ভয় হয় আমার। রক্তের জন্য পুলকেশও তো হন্যে হয়ে ঘুরছে। ও গ্রুপের রক্ত তো সবাইকে দেওয়া যায়। তাহলে আমার বোতলটা ও যদি কেড়ে নেয়? কিম্বা আজ রাত্তিরেই যদি ওর বাবার জন্যে দিতে বলে?—আজ আমি রক্ত দিতে পারবো না। না, রমা না সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত কিছুতে না।

পুলকেশ আমাকে দেখছে। ক্রমশঃ আমি এগিয়ে যাচ্ছি ওর দিকে। তারপর ওর মুখোমুখি। ও কি আমার পথ আটকাবে? অলকেশকে বিশ্বাস করা যেত, কিন্তু পুলকেশকে?

পুলকেশকে পাশ কাটিয়ে আমি প্রাণপণে মেটারনিটি বিল্ডিং-এর দিকে দৌড়োতে থাকি।

পিছনে ওর গলার অওয়াজ পাই: আস্তে, পার্থদা, আস্তে,—বোতলটা যে পড়ে যাবে!'

থামি না আমি। গতি কমাই না। পিছন ফিরে চেয়েও দেখি না। আমার খুব ভয়, পিছনে তাকালেই দেখা যাবে রক্ত-লোলুপ এক হিংস্র জানোয়ারকে।

সেই সুর

‘This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.’
—T. S. Eliot

আধো অন্ধকার রাজপথে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ভাঙাচোরা। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। আতঙ্কে কাঁপছি আমি। হাঁপাচ্ছি। আমার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে, কোলে আকাশের মত ঘন কালি। কালো ধোঁয়া জমছে আকাশে,—ইরাক ইরান নিকারাগুয়া বা লেবানন থেকে উড়ে এসে জমছে মাথার উপর। আমার নিঃশ্বাসে কষ্ট। আমার চেয়ে থাকতে কষ্ট। আমি নুয়ে পড়ছি ক্রমশঃ। বারম্বার তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজ আমাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। বিংশ শতক শেষ হতে চললো, তবু আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। হা ঈশ্বর, আজ রাতেও আমার ঘুম আসবে না।

হঠাৎ একটা নরম সুরেলা শব্দ। গান কিম্বা বাজনা। অদ্ভুত মিষ্টি। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

আমি চমকে উঠলাম। কান পাতলাম সুরে। বিলম্বিত একটানা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোথেকে আসছে?

আমি ভ্রু কুঁচকে চারপাশে তাকালাম। কেবল আকাশ ছোঁয়া বাড়ি, কারখানার চিমনি, কালো রাজপথে গাড়ির সার আর ব্যস্ত মানুষ— আমারই মতন ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত—কাকতাড়ুয়া। কালো আকাশ দেখতে দেখতে সন্ত্রস্ত পায়ে চলেছে সবাই।

তাহলে কে তুলছে এই মন-মাতানো সুর? মহানগরে এমন গান গায় না তো কেউ। রেকর্ডের গান তো সব সময়েই বাজে, মিষ্টি তো লাগে না। এ সুর এত মধুর যে মন কেড়ে নেয় অনায়াসে। পাথর চুইয়ে যেমন জল নামে ফোঁটায় ফোঁটায় অন্ধকার চুইয়ে যেমন শিশির মাখা আলো ঝরে পড়ে তেমনি ইট কাঠ লোহা কংক্রীট চুইয়ে সুর প্রবেশ করছে আমার কানে, আমার বুকের মধ্যে। আমি চারপাশ দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগলাম দ্রুত। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে পিছনে। যত হাঁটছি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুর। ক্রমশঃ উদাত্ত হয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে আকাশ বাতাস। কিন্তু কোথায়? কোথায় উৎস তার?

রাজপথে ব্রেক কষার কর্কশ আওয়াজ। সার সার গাড়ি। সুর হারিয়ে গেল। আমি ব্রীফকেসটা হাত বদলে নিলাম। নেকটাই ঠিক করলাম। আর ঠিক তখনই মনিবন্ধ থেকে উঠে এল সেই ধাতব আওয়াজ, হ্যালো ওয়ান নাইন এইট সিক্স, হ্যালো...... হ্যালো...।

উঃ। আবার ক্লান্তি আসছে জড়িয়ে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু না। রাজপথ পেরোতেই আবার ধীরে ধীরে শোনা যাচ্ছে সেই সুর। সেই আশ্চর্য শব্দ ঝংকার।

আমি কান পেতে শুনি আর দ্রুত হাঁটতে থাকি।
মনে হচ্ছে আর একটু এগোলেই আমি পৌঁছে যাব এই সুরের উৎসে।

মনে হচ্ছে ঐ সামনে রেল লাইনের ওপার থেকে ভেসে আসছে সুর লহরী। কিন্তু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতেই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। কর্কশ হর্ণের আওয়াজ তুলে ট্রেনটা আবার দু ফুট সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে আমার হাতের ব্রীফকেস আর মনিবন্ধের ঘড়িটার কথা। ব্রীফকেস হাত বদলে ঘড়িটা চোখের কাছে তুলতেই শুনি সে ডাকছে ক্রমাগত : হ্যালো হ্যালো, ওয়ান নাইন এইট সিক্স, হ্যালো⋯।

ওঃ, অসহ্য। এক্ষণি হয়তো কর্কশ আওয়াজে সাইরেন বেজে উঠবে। কিন্তু সেই সুর? সেই গান? কোথায় হারিয়ে গেল?

না। ঐ তো! ঐ তো শোনা যাচ্ছে আবার। আঃ, কি মিষ্টি! যেন ভব-ভরন্ত অজয়ের তীরে ভোরের নরম আলোয় এক-তারা বাজিয়ে গলা ছেড়ে গাইছে বাউল। যেন পড়ন্ত বেলায় ছোটনাগপুরের মালভূমিতে মোষের পিঠে বঁশি বাজিয়ে ঘরে ফিরছে বালক। আঃ ক্রমশঃ উদাত্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই সুরের ইন্দ্রজাল। মহুয়া ফুলের গন্ধের মত আমায় মাতাল করে দিচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

কিন্তু এখনই ঘুমিয়ে পড়লে আমি কেমন ক'রে যাব তার উৎসে? এই অনির্বচনীয় আনন্দের উৎসে যে আমায় পৌঁছোতেই হবে!

সামনে স্কাইস্ক্র্যাপার। আমি তার লিফটে উঠলাম ছাদে। এখান থেকে মহানগরের অনেকখানি এক নজরে দেখা যায়,—যাকে আমরা বলি এরিয়্যাল ভিউ। সুর এখানে আরো স্পষ্ট, আরো উদাত্ত। কিন্তু আকাশ যে এখানে বড় কাছাকাছি। আকাশে জমাট ধোঁয়া। এক্ষণি হয়তো এরিয়্যাল ভিউতে আমি ধরা পড়ে যাবো। আমাকে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে হবে।

মাটি থেকে উঠে আসছে সুর। মাটি আমাকে ডাকছে।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো কর্কশ আওয়াজে। আমার মনে পড়লো আমার অনেক কাজ। আমার পকেট ভর্তি কাগজ পত্র। ব্রীফকেস ভর্তি ম্যাপ আর দলিল। আমি ঘড়িটা চোখের কাছে তুলে সময় দেখতে চাইলাম। কিন্তু ঘড়িটা যে বন্ধ হয়ে গেছে! কী সবনাশ! আমি এখন কেমন ক'রে হিসেব করবো ঠিক কত মিনিট কত সেকেণ্ড সময় . .

আকাশের দিকে মুখ তুললাম আমি। আকাশ ভরা কালো ধোঁয়া। এল সালভাদর, নামিবিয়া নাকি নিকারাগুয়া থেকে উড়ে এসে জমছে মাথার উপর আতঙ্কে রক্ত জল হয়ে আসছে আমার। ক্রমাগত সাইরেন বেজে চলেছে। কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে শুকিয়ে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত আমি কাঁপছি। আমাকে পালাতে হবে। এক্ষণি, হাঁ এই মুহূর্তেই আমাকে পালাতে হবে।

দৌড়ে ছাদের কার্নিশে চলে গেলাম আমি। নির্দ্বিধায় লাফাতে যাচ্ছি নীচে, এমন সময় আবার সেই গান. সেই সুরের ঝর্ণাধারা। কত মধুর, কত উদার! কত অনাবিল ভাবে ঢুকে যাচ্ছে আমার মধ্যে! মথিত করছে প্রাণ মন। আমায় বাঁচিয়ে তুলছে! এ সঙ্গীতের ভাষা বোঝা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। যেমন সমুদ্রের কল্লোল, অরণ্যের মর্মর. পাখির কাকলি, শিশুর আধো আধো কথা।

নীচে নেমে মনে হলো কাউকে জিগ্যেস করা যাক। হাজার হোক আমিও মানুষ, ওরাও মানুষ।

'একটা সুর শুনতে পাচ্ছেন?'—আমি এক পথচারীর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

'সুর?'—ভদ্রলোকের চোখে মুখে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক।

'হ্যাঁ সুর,'—আমি হাসলাম—'খুব মিষ্টি, গান কিম্বা বাজনা···ঐ যে শোনা যাচ্ছে, ঐ যে··· ..'

ভদ্রলোক আমাকে সভয়ে দেখতে দেখতে পিছোতে লাগলেন।

'আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন, ভারত মহাসাগরের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি সংসারী লোক, বিশ্বাস করুন······'—বলতে বলতেই ভদ্রলোক প্রাণপণ দৌড়ে পালাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল সুর। সাইরেনের তীব্র আওয়াজ জেগে উঠছিল ক্রমশঃ। ব্রীফকেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি দু-হাতে মাথার চুল ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম। ইস্ আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করে না কেউ!

আচ্ছা, এইবার দেখি খালি হাতে এগিয়ে আমি আর একজনের পথ আটকালাম।

'এক্সকিউজ মী, আমি অনেকক্ষণ ধ'রে একটা খুব মিষ্টি সুর শুনতে পাচ্ছি। আপনি পাচ্ছেন না?'

'মতলব কী আপনার?'—মেয়েটি কর্কশ গলায় বললো।

'না, মানে, বিশ্বাস করুণ, সত্যিই একটা অদ্ভুত মিষ্টি সুর'···আবেগে সামনে ঝুঁকলাম আমি।

'স্কাউণ্ড্রেল! লম্পট কোথাকার।'

—মেয়েটি বুকে হাত চেপে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি অবাক—এত উদাত্ত অনাবিল সুর ওরা শুনতেই পেল না! বারম্বার সাইরেনের শব্দে ওদের ইন্দ্রিয়গুলো কি ম'রে গেছে? নাকি আমাকে দেখেই ওদের······।

ভাবতে ভাবতেই সুর হারিয়ে গেছে যথারীতি। একটানা সাইরেনের আওয়াজ চিরে দিচ্ছে আকাশ বাতাস। যন্ত্রনা জ্বালা

ক'রে কাটছে আমার ভেতরটা।

আমি পালাতে লাগলাম আবার। প্রানপণ দৌড়োচ্ছি আমি রাজপথে। ইতস্ততঃ সাপের হিসহিস শব্দের মত ব্রেক ধরা চাকার আওয়াজ উপেক্ষা করে আমি দৌড়োচ্ছি। তারপর কিছুর ধাক্কায় ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে।

মাটি। হ্যাঁ সবুজ মাটি। ময়দান। ইট লোহা কংক্রীটের মহানগরে য এমন সবুজ মাঠ আছে আমার খেয়াল ছিল না।

দরদর রক্ত বার হচ্ছিল। কিন্তু যন্ত্রণা নেই আমার। কারণ সেই আশ্চর্য অলৌকিক সুর আমি আবার শুনতে পাচ্ছি। আকাশ বাতাস মাটি ভিজিয়ে ভেসে ভেসে আসছে সেই ছন্দময় সঙ্গীত। আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি মাতাল। আমার ঘুম আসছে।

কিন্তু আমাকে যে খুঁজে বার করতে হবে তার উৎস।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম দ্রুত এদিকে ওদিকে। সুর ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে কাছে। হাজার গলার গানের মত নেচে নেচে পাক খাচ্ছে আমাকে ঘিরে। আমার ও ইচ্ছে করছে নাচতে। নাচতে গেলে আরও হালকা পায়ে চলতে হবে। আমি জুতো খুলে ফেললাম। চলতে চলতে খসখস আওয়াজ হচ্ছিলো পকেটের কাগজপত্রে। আমি কাগজগুলো উড়িয়ে দিলাম বাতাসে। ঘামে লেপ্টে ছিল জামা। আমি খুলে ছুঁড়ে ফেললাম। আমার কোমর জড়িয়ে ছিল প্যান্ট। খুলে ফেলে দিলাম। আঃ। শিশুর মতই ভারমুক্ত আমি এখন। অনায়াসে নেচে বেড়ানো যায় ঐ সুরলহরীর তালে তালে। সুর এখন দারুণ স্পষ্ট। জোয়ারের জলের মত বাঁধন-হারা অনাবিল।

নাচতে নাচতে এতটুকু ক্লান্তি আসে না আমার। ক্রমশঃ বেশি বেশি উৎসাহে আমি পাগলের মত নেচে চলেছি। হ্যাঁ

পাগলইতো! এখন মহানগরের অবিরাম ধাতব আওয়াজ, আর্তনাদ, সাইরেন—শতাব্দীর শব্দ সমূহ শোনা যায় না যে কিছুই! শুধুমাত্র ঘড়ির তির তির আওয়াজ। মনিবন্ধ থেকে উঠে আসা ঐ একমাত্র শব্দ যা এখন বেমানান। এই আশ্চর্য সুরছন্দে একমাত্র বেহিসেবী তাল!

কিন্তু ঘড়িটা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার চলতে শুরু করলো নাকি?

মুহূর্তে ঘড়িটা দেখলাম আমি। কী আশ্চর্য!—কাঁটাগুলো যে উল্টো দিকে ঘুরছে। এবং ক্রমশ দ্রুত! অবিশ্বাস্য গতিতে কাঁটা পিছনে ছুটছে। এটা কিসের নির্দেশ? আমি কি পালাবো? কিন্তু দৌড়াতে দৌড়োতে পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেও এই শতাব্দীর শেষ প্রহর আমাকে ছাড়বে না! কাউকেই ছাড়বে না! তার চাইতে ·····।

ঘড়িটা মনিবন্ধ থেকে খুলে আমি সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম আকাশে। তারপর খুঁড়তে লাগলাম মাটি। এই মাটিই আমায় বাঁচাবে। মাটির গর্ভে আছে সুরের উৎস—আমার নিশ্চিৎ নিরাপদ আশ্রয়।

দু-হাতে মাটি খুঁড়ছি আমি। আমার আর কোন ভয় নেই। সংশয় নেই। সুর আমাকে ডাকছে। শত শতাব্দ প্রাচীন ধরিত্রীর গর্ভ ডাকছে মায়ের মতন! আমাকে পৌঁছোতেই হবে সেখানে! কত কাল, হায় কত কাল আমি দূরে!

প্রচণ্ড উৎসাহে মাটি খুঁড়ছি আমি। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আমার নখ বড় হচ্ছে। শক্ত হচ্ছে। কব্জি হচ্ছে চওড়া। শরীর ভরে উঠছে বড় বড় লোমে। আমার চুল বড় হচ্ছে। দাড়ি বড় হচ্ছে। চুল, দাড়িতে ভরে উঠছে সারা মাথা-মুখ। মুখের মধ্যে আমার দাঁত

বড় হচ্ছে। ধারালো অস্ত্রের মত শক্ত ছুঁচলো দাঁত।

আমি দাঁত দিয়ে মাটি কাটছি। দাঁতে-নখে হাতে পায়ে আমি পাগলের মত মাটি কেটে চলেছি। গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি মাথা। এখন ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছি নীচে। যত নামছি সুর ক্রমশঃ বেশী বেশী জড়িয়ে ধরছে আমায়। বন্যাব মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে। ধরিত্রীর গর্ভে অনির্বচনীয় বঙ রূপ ধ্বনি। এখানে সমুদ্র কল্লোলের মত উত্তাল সুর-নির্ঝরে ভাস ছ জীবন। আঃ মুক্ত, মুক্ত আমি। আমার এখানে কোন শত্রু নেই! এখানে যে সুরের ঐকতান! মানুষ মানুষের সাথে গলা মিলিয়ে গান গায়, আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে করছে আমিও ঐ ঐকতানে গলা মেলাই।

আমি হাঁ করলাম। আমার শিরা ফুলে উঠলো। কিন্তু সুর বেরলো না মুখ দিয়ে। আমি সবশক্তি দিয়ে গাইবার চেষ্টা করলাম। রক্ত ঝ'রে পড়লো গলা থেকে, এতটুকু আওয়াজ বেরলো না! আসলে... ..আসলে .....এ গান গাইতে আমি ভুলে গেছি। কত সহজ সরল এই সুব কত চেনা-জানা—একটা শিশুও গলা মেলাতে পারে, কিন্তু আমি পারি না।.........

তড়িতাহত পরমাণুর মত আমি কাঁপতে লাগলাম। কাঁপতে কাঁপতেই লক্ষ্য করছি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে এই অলৌকিক সুর। দেখতে দেখতে আমার নখ ছোট হচ্ছে, দাঁত ছোট হচ্ছে, চুল দাড়ি লোম সব ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমার পরনে উঠে আসছে আধুনিক বেশবাস। ডান হাতে ব্রীফকেস, বাঁ হাতের কব্জিতে সেই ঘড়িটা। টিক টিক ক'রে চলছে সেটা। ঘণ্টা-মিনিট সেকেণ্ডে সময় দিচ্ছে সঠিক। আমি শুনতে পাচ্ছি কালো রাজপথে গাড়ির আওয়াজ, ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে মানুষের আর্তনাদ, আকাশ চেরাতীব্র

সাইরেন। মাথার ওপরে চক্কর দিচ্ছে প্লেন। মনিবন্ধ থেকে শব্দ উঠে আসছে একটানা—হ্যালো, ওয়ান এইট সিক্স, হ্যালো হ্যালো······।

কালো ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। আমি তাকাতে পারছি না। আমার নিঃশ্বাসে কষ্ট। আমি ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছি। বিংশ শতক শেষ হতে চললো, তবু আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না।

হা ঈশ্বর, আজ রাতেও আমায় কালো আকাশ দেখে কাটাতে হবে।

চোর চোর

'আমি আসবাফ আলি গো বাবুরা, নিবাস আটাগড়, পেশা ধান-চালের খাটো কারবার এজ্ঞে।'

—কথাগুলো একনাগাড়ে আউড়ে যাচ্ছিল লোকটা তোতা পাখির মত। মাটিতে উবু হয়ে মাথাটাকে দু-হাঁটুর ফাঁকে ঢুকিয়ে দু হাত উপরে তুলে ও মার খাচ্ছিল। দেখলেই বোঝা যায় ওস্তাদ। মাথা আর বুক বাঁচাতে জানে। চারপাশের লোকজন ওকে বাঁশ, সাইকেলের চেন আর জুতো দিয়ে পেটাচ্ছিল। লাথি ঘুষি তো ছিলই। ওর হাত-পা পিঠ কেটে রক্ত পড়ছিল। রক্ত পড়ছিল ওর মুখ থেকেও। মারের চোটে ও গড়াচ্ছিল ধুলোয়। কিন্তু যতই গড়াক মাথাটাকে দু-হাঁটুর ফাঁকে বুকের আড়ালে সাবধানে বাঁচিয়ে। আর সমানে আউড়ে যাচ্ছে এক কথা —'আমি আসবাফ আলি গো বাবুরা, নিবাস আটাগড়, পেশা ধান-চালের খাটো কারবার।' —যেন পরিচয় দিলেই ওর রেহাই। কিন্তু চোরের নাম-ধাম নিয়ে কে কবে মাথা ঘামায়? মদন কার্ফার বাড়ি থেকে দু বস্তা ধান সরিয়েছে সে। অকাট্য প্রমাণ মদন কার্ফার বাপ। কাল বিকেলে আসরাফ ওদের বাড়ি ধান কিনতে গিয়েছিল। বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখেও এসেছিল ঘরের মধ্যে বস্তা-

বন্দী ধানের লাট। তারপর আজ সকালে দেখা যাচ্ছে বস্তা পাঁচেক সাফ। আসরাফ ছাড়া আর কার কাজ? পাকা বাড়ির দরজার খিল বাইরে থেকে কেটে ঘুমন্ত মানুষ জনের পাশ থেকে নিঃশব্দে ধানের বস্তা তুলে পগার পার হয়ে যাওয়ার মত পাকা হাত আর ক-জনের হয়?

সুতরাং সাত-সকালেই আসরাফকে ধরা হয়েছে। ও তখন চালের বস্তা নিয়ে পলাশপুর হাটতলায় বাস ধরার জন্যে হাজির। সকাল থেকে চলছে মার। দুপুর গড়াতে চললো তবু স্বীকার করলো না এখনো।

ঈদ্রিশ মণ্ডল আসরাফের ডানহাতখানা ধরে গামছা নিঙড়োনোর মত মোচড়াতে লাগলো। 'বল কী করেছিস ধান। বল...' যত মোচড়ায় ততোই আসরাফও ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ওস্তাদ চোর। আর সমানে সেই একই কথা—'বিশ্বেস করেন আমি আসরাফ আলি এজ্ঞে নিবাস আটাগড়, পেশা ধান চালের খাটো কারবার।'

কথা মিথ্যে নয়। লোকে চেনে ওকে। রোজ বিকেলে বস্তা হাতে বাড়ি বাড়ি খুচরো ধান কিনতে বেরোয় ছেলেকে নিয়ে। সে সব ধান সেদ্ধ শুকনো ক'রে চাল বানিয়ে সকালের বাসে কৃষ্ণনগর যায়। সবই সত্যি। কিন্তু চুরিও সত্যি। আর সে চুরি যে আসরাফই করেছে তাতে সন্দেহ নেই। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে লোকটা। মাস খানেক হ'ল আটাগড়ে এসে সংসার নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে, বৌ, একটা বোন, তার আবার এক পাল। এই শুয়োরের খোঁয়াড় নিয়ে কত গাঁয়ে যে ঢুকেছে আর ছেড়েছে তার ঠিক নেই। টিকবে কী করে? জেনে শুনে চোর পুষবে এমন আহাম্মক আর কোন গাঁয়ের লোক! তাই মেরে তাড়িয়েছে সবাই।

'ওর হাত-দুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। চোখ উপড়ে নাও। শালা পাকা চোর।'

—কেউ বিধান দিলে। কিন্তু হাত মোচড়াতে মোচড়াতে ঈদ্রিশ মণ্ডল হিমশিম খাচ্ছে।

'গুঁড়ুবি কোনখানটায়। হাড় আছে নাকি ওর? মছলন্দপুরে মড় মড়িয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল না?'

বৃত্তান্তটা কারো কারো জানা। মছলন্দপুরে থালা-বাসন চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল আসরাফ। আসরাফকে বেঁধে ওর দু-হাত থান ইটে রেখে শাবলের বাড়ি মেরে হাড় ভেঙে চুরচুর করে দেওয়া হয়েছিল। মাসখানেক চুন-হলুদ লাগিয়ে দিব্যি জোড়া লাগিয়ে ফেললে হাত। পরে এর চাইতে আরো আশ্চর্য অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে আসরাফ। যারা জানে তারা বলাবলি করতে লাগলো। কৈচোরে মুখুজ্জেদের বাড়ি চুরি করেছিল এক হাতে পেল্লায় একটা তোরঙ্গ, মাথার ওপরে থালা-বাসন ভর্তি পুঁটুলি, অন্যহাতে একটা সাইকেল—আসরাফ মাঠ ভাঙছিল রাতারাতি। আলকেউটেয় কামড়ে দিল মাঠে। কাপড় ছিঁড়ে বাঁধন দিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে বিষরক্ত বার করে আবার গটগটিয়ে হেঁটে চললো আসরাফ মালপত্তর নিয়ে। এদিকে জেগে উঠেছিল মুখুজ্জে বাড়ির লোক। লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে খোঁজা-খুঁজি শুরু করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। মাটিতে ছাপ দেখে দেখে পিছু নিয়েছিল। মাঠের মধ্যে সাপে কেটে বাঁধন দিতে সময় লেগেছিল আসরাফের। তারপর বিষের জ্বালা। বামাল নিয়ে টালমাটাল হাঁটছিল, পেছন থেকে কাঁড় ছুঁড়লে মুখুজ্জেদের বড় ছেলে। এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল আসরাফের কোমর।

ঐ অবস্থায় বামাল ফেলে পালিয়েছিল আসরাফ। মাঠে মাঠে সোজা বর্ধমান হাসপাতাল। মাত্র তিন দিনের মাথায় সটকেছিল

হাসপাতাল থেকে —ডাক্তারদের অবাক করে দিয়ে।

এর আগে নন্দীপুরে চুরির দায়ে ওর একটা চোখ উপড়ে নেয় গাঁয়ের লোক। দীঘল গাঁয়ে গরু চুরি করে ধরা পড়েছিল আসরাফ। গাছের ডালে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাত-দুপুর অব্দি ঠেঙিয়ে গাঁয়ের লোক দেখলে ও মরে গেছে। শ্বাস নেই, নাড়ি নেই। শুধু সমানে রক্ত পড়ছে নাক-মুখ দিয়ে। ব্যাপার দেখে সরে পড়তে লেগেছিল লোকে যাবার আগে কেউ দড়িটি কেটে দিয়ে যায়। মরা মানুষ ঝুলে থাকার চেয়ে শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাক। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে প্রমাণ লোপাট করে দিক। কিন্তু পরদিন আসরাফকে ঘরের উঠোনে রোদ পোয়াতে দেখে লোকে থ। সর্বাঙ্গে গাঁদাল পাতার রস আর চুণ-হলুদ। আসরাফ দিব্যি জ্যান্ত!

অর্থাৎ যতই মারো ও মরবে না। লোকটা অমর। সুতরাং হাত দু'টো কেটে দেওয়াই বিধেয় তাতে অন্ততঃ চুরি বন্ধ হবে।

—ঈদ্রিশ মণ্ডলের বিধান শুনে মাংসের দোকান থেকে বড় ছুরি নিয়ে হাজির হল একজন। খপ করে তার হাতটা ধ'রে ফেললে বংশী। পঞ্চায়েতের সদস্য।

'করিস কী? সব্বাইকে জেল খাটাবি নাকি?'—বংশী বললে, 'তার চাইতে একে গাঁ থেকে তাড়া।'

কথা শুনে হৈ হৈ করে রাজি হয়ে গেল লোকে। কিন্তু ধড়াস করে বংশীর পায়ে পড়লে আসরাফ।

'গাঁ হতে তাড়াবেন না বাবু। জানে মারা যাবো এজ্ঞে। কোন গাঁয়ে কাজ জোটে না।' হাউহাউ কেঁদে উঠলো আসরাফ। রক্তে-কাদায় মাখামাখি মুখ তুলে জোড় হাতে ওলট-পালট খেতে লাগলো রাস্তায়। আসলে বড় সংসার চালাতে লোকটা হিমসিম। মুসলমান বলে ঠাঁই হয় না সর্বত্র। কাজও জোটে না। হিন্দুর বাড়িতে

মুসলমানকে কাজে নেবে কে? সুতরাং আটাগড়—মুসলমানের গাঁ, কাছেই বাসরাস্তা, হাটতলা। ধান-চালের কারবারটাও মন্দ চলে না। খাটতে পারলে পয়সা আছে।

এসব বোঝে সবাই, কিন্তু গাঁয়ের ভেতর চোর পুষতে আর কে চায়? সবাই যখন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে তখন একটা মোক্ষম বিধান দিলে বংশী: 'একটা শর্তে তোকে গাঁয়ে থাকতে দেওয়া যায়। তোকে কথা দিতে হবে এ গাঁয়ে আর চুরি হবে না।'

সবাই চুপ। আসরাফের দিকে চেয়ে দেখছে। আসরাফ খানিক ভেবে বললে, 'তা কী ক'রে বলি এজ্ঞে? আমি চুরি ছেড়ে দিচ্ছি, ভগবানের দিব্যি, আল্লার কসম,—কিন্তু আমি ছাড়া কি আর চোর নেই?'

সেটাই তো কথা। —বংশী বললে. তুই পাকা চোর, চোরের বাপ। তোকে আমরা পুষবো, তুই চোর ধরবি! লোকে ইঁদুর মারতে বিড়াল পোষে জানিস না?'

হৈ হৈ করে সায় দিলে গাঁয়ের লোক। খাসা প্রস্তাব।

আসরাফ উঠে বসে ভাবতে লাগলো। এ গাঁয়ে থাকতে হলে এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'ঠিক আছে বাবু, চোরই ধরবো।' —বলে ছেলের কাঁদে হাত দিয়ে বাড়ি চলে গেল আসরাফ। দিন তিনেক কাটা জায়গাগুলো গাঁদাল পাতা থেঁতো করে লাগিয়ে বসে রইল। তারপর কারবার শুরু করলো যথারীতি। ছেলেকে নিয়ে ধান কিনে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি, সেদ্ধ-শুকনো ক'রে ভেঙে চাল বানিয়ে বেচতে যায় কৃষ্ণনগর। পথের ধারে ফাঁকা মাঠে ওর ছিটেবেড়ার ঘর। অনেক রাত পর্যন্ত উঠোনে আগুন জ্বলে, ধান সেদ্ধ হয়।

চুরি হতে কিন্তু দেরি হ'ল না। শৈলেন রায়ের নধর পাঁঠা

দিনের বেলায় হাপিস হয়ে গেল। লতিফ মিঞার গোটা তিনেক মুরগী চবতে গিয়ে আর ঘরে ফিরলো না। জনাব হোসেন আলি মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। দিন-দুপুরে ওঁর গরুর গাড়ির হাল খুলে নিলে কেউ। নটবর বিশ্বাসের জমি থেকে ধানের শিষ কেটে নিয়েছে কারা—এমনি সব অভিযোগ আসতে লাগলো ঈদ্রিশ মণ্ডলের কাছে।

ঈদ্রিশ বললে, 'কী ব্যাপার আসরাফ? কথা কী ছিল?'

হাত জোড় ক'রে হাসলে আসরাফ—'এজ্ঞে দিন-দুপুরে ছিঁচকে চুরি— সবার চোখের সামনে ঘটছে—এর আমি কী করতে পারি হুজুর?'

মুখে বললে বটে, কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসরাফ ঘুরে বেড়াতে লাগলো গরিব পাড়ায়। দুলে বাগদি মুসলমান—হাঘরে হাভাতের ঘরে ছুঁই ছুঁই নেই। আসরাফ সোজা গিয়ে ঘরের কোণে উঁকি মারে। 'কী ব্যাপার? ধান পেলি কোথা?'

'শিষ কুইড়ে এনেচে ছেলেগুলো।'

'শিষ কুইড়ে এত?'

'ইঁদুরের গর্ত হতেও এনেচে।'

'বাজে বকিসনি। কায়দা ক'রে শিষ কাটা ধান। আর করিস নি। বাবুদের বলে দোব।'

শুধু এই নয়, সময় পেলেই আসরাফ হাটতলায় ঘোরাঘুরি করে। নজর রাখে হঠাৎ বাবুয়ানি শুরু করলে কে, নেংটির ওপর গামছা ছেড়ে চকচকে ফুলপ্যান্ট পরছে কোন বাবু, বিড়ি ফেলে পেছনে তুলো গোঁজা সিগ্রেট ফোঁকা ধরেছে কোন্ আহাম্মক।

দেখতে দেখতেই বড়-সড় চুরি হয়ে গেল ঘোষপাড়ায়। সাত সকালে লোকজন নিয়ে অনাদি ঘোষ এসে তুললে আসরাফকে।

তলপেটে লাথি কষিয়ে বললে, 'এটা কিরকম হ'ল শালা ? গাঁয়ে চোর পুষবো, তবু চুরি হবে—এতো চলবে না। এ তোরই কাজ।'

চুরি গেছে অনেক কিছু। বাক্সপ্যাঁটরা, জামাকাপড়, নগদ টাকা থালা-বাসনে মিলিয়ে হাজার খানেক টাকার ধাক্কা। তন্ন-তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল আসরাফের কুঁড়ে। তারপর বেধড়ক মার। 'বল শালা কোথায় পাচার করিচিস মাল ?'—অনাদি ঘোষ লাথি কষাতে কষাতে হুঙ্কার ছাড়লে।

'বিশ্বেস কবেন বাবু, ছোট মেয়ের জ্বর। সারারাত ডাক্তার ঘর কবিচি। শুধোন এজ্ঞে শ্যামলালবাবুকে।'

শ্যামলাল কম্পাউণ্ডার সাক্ষ্য দিলে। হ্যাঁ, সারাবাত ছটফটিয়েছে বটে মেয়েটা। বার দুই শ্যামলালের কাছে ছুটেছেও আসরাফ।

'কিন্তু তোর ব্যাটা'?—আসবাফের ছেলেব দিকে আঙ্গুল তুললে অনাদি ঘোষ '—চোবের পো চোর হয়। রাতভোর তোর ছেলে কোথায় ছিল ?'

ছেলেটা সতের-আঠারো বছরের। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। দু-চার রদ্দা খেতে না খেতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে। 'আমি তো ঘরেই ছিনু। ধান সেদ্দ করিচি।' —বলতে বলতেই ফিট। দেখেশুনে লোকে ভড়কে গেল। তাছাড়া ছেলেটার স্বভাব চরিত্তির মন্দ বলে জানা যায়নি—বললে কেউ কেউ। রাতে ধান সেদ্দরও প্রমাণ ছিল। সুতরাং রাগে গজগজ করতে করতে ঘরমুখো হাঁটা দিলে অনাদি ঘোষ।

পিছু পিছু চললো আসরাফ। সোজা অনাদির বাড়ি গিয়ে বললে, 'এজ্ঞে ছোঁব না কিছু, একটিবার দেখতে দ্যান চুরির থান। চোর ধরা যায় কিনা দেখি।'

শুনি একটু ঠাণ্ডা হ'ল অনাদি ঘোষ। আসরাফ খুঁটিয়ে দেখলে।

মাটির ঘরে নিখুঁত সিঁদ কেটেছে চোর। নিঃশব্দে মাল নিয়ে দরজার খিল খুলে পালিয়েছে। ঘর-বার ভাল করে দেখলে আসরাফ। তারপর সিঁদের গর্ত থেকে একটা পোড়া বিড়ি তুলে নিয়ে হনহন হাঁটা দিলে।

সোজা ফকা বাউরির ঘর। ফকা ঘুমোচ্ছিল। তুলে আসরাফ বললে, 'কোথায় পাচার করলি মাল?'

'তার মানে?' —ভ্রু কুঁচকে তাকালো ফকা।

'মানে অনাদি ঘোষের' মাল—যা সরিয়েচিস কাল রাত্তিরে।' গম্ভীর ভাবে বললে আসরাফ।

'কী বলছো কী তুমি? আমি কিছুই জানি না। ঘুমুচ্ছিনু। শরীল খারাপ।'

'চপ'। —ধমকালো আসরাফ, 'বেলা দুপুর অব্দি ঘুমুচ্ছিলি তোর এতো শরীর খারাপ? শোন, আমি দু যুগের চোর, আমার চাইতে বড় চোর এ তল্লাটে নেই। অনাদি ঘোষের ঘরে সিঁদের ভেতর এই পোড়া বিড়ি দেখে ধরিচি। সবুজ সুতোয় বাঁধা, ভেতরে গ্যাঁজা। এ তোর নিজের হাতে বাঁধা। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবিনি। তোর শ্বশুর ঘর অব্দি ধাওয়া করলে তোর সম্বন্ধি এখুনি বামাল শুদ্ধু ধরা পড়ে যাবে।

ঝপাং করে আসরাফের পায়ে পড়লে ফকা।

'তোমার পায়ে পড়ি। বাবুদের কানে তুলো না। মার খেয়ে প্রাণ যাবে।'

'কিন্তু তোদের দুষ্কর্মের ভাগী যে আমায় হতে হচ্ছে। ভাঙা গতরের উপরে এন্তার লাথি কষিয়ে গেল অনাদি ঘোষ। তোকে কথা দিতে হবে আর চুরি করবিনি'।

'কথা দিচ্ছি, আসরাফদা, কথা দিচ্ছি।'—বলে আসরাফের

দুহাত ধরলে ফকা। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কিন্তুন খাবো কী?—জানোইতো জন্ম-ইস্তুক একটা ফুসফুসি নেই। একনাগাড়ে বেশিক্ষণ খাটতে পারি না বলে কাজে নিতে চায় না বাবুরা। একটা পেট তবু চলে যায়, কিন্তুন দুটো বিইয়েচে বউ, অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে বাড়িতে। যমে যদ্দিন না নেয় তদ্দিন তো খেতে দিতে হবে। একটা উপায় বলতে পারো যা ত সংসারটা বাঁচে?'

সামনে তেঁতুল তলায় ফকার বছর পাঁচেকের হাড় জিরজিরে ছেলেটা ফকার মায়ের বুক চুষছিল। সেই দিকে চেয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললে আসরাফ। বললে, 'কাজ জোটে না তোর?'

'কোন দিন জোটে, কোনদিন জোটে না।' —ফকা বললে, 'বোরো চাষ তো হলইনি এবার। আকাশের জল না নামলে আমনও কানা'

শুনে একটু ভাবলে আসরাফ। তারপর বললে, 'তুই আমার সঙ্গে কাজ করবি—ধান কেনা বেচার?'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল ফকা। কেউ জানলো না কিছু। পুঁজি দিলে আসরাফ। হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ধান কিনে বেড়াতে লাগলো ফকা

গাঁয়ে চুরি কিন্তু বন্ধ হল না। পুকুরের মাছ, বাগানের নারকেল-কলা, হাঁস মুরগী—মাঝে মধ্যে লেগেই রইল চুরি—যেমন বরাবর থাকে, সব গাঁয়েই থাকে। এঁটো বাসন, ভিজে কাপড়, সিদ্ধ ধান—এরকম ছিঁচকে চুরির কথা মাঝে মধ্যে শোনা যেতে লাগলো। রাতারাতি রান্নাঘরে ঢুকে বাসি ভাতও খেয়ে যায় চোরে। গেরস্থ খিলের ওপরে খিল তোলে, রাত জেগে পাহারা দেয়। আর কথায় কথায় পঞ্চায়েতে নালিশ হয়ঃ আসরাফ কিন্তু কথা দিয়েছিল ও থাকতে এ তল্লাটে চুরি হবে না, ও চোর ধরবে।

তবু ছোটখাট চুরি বলে আসরাফকে তেমন কিছু বলা হয় না। কিন্তু বছর না ঘুরতেই মোটামুটি বড়সড় চুরি হয়ে গেল পাশের গাঁ শক্তিগড়ে। নিতাই হাজরার পাকা বাড়ির খিল কেটে পাকা হাতে নিয়ে গেল সব। কত নিয়েছে লোকের সামনে ভাঙলে না নিতাই হাজরা। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্য বংশীর কাছে নালিশ ঠুকে গেল : এ পাকা হাতের কাজ—নির্ঘাৎ আসরাফ।

আসরাফের কপাল ভাল—দিন তিনেক ওলাউঠোয় শয্যাশায়ী ছিল। কিন্তু পুলিশ এল। বাপ-ব্যাটা দুজনকেই ধরে নিয়ে গেল থানায়। সর্বাঙ্গে কালশিটে নিয়ে দিন কতক পর ছাড়া পেল আসরাফ।

ফিরেই আবার চোর খুঁজতে লাগলো। চাল নিয়ে নিজে না গিয়ে ছেলেকে পাঠালে কৃষ্ণনগর। আর সময় পেলেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো হাট-বাজার চায়ের দোকান।

দিবাকরের দোকানে ব'সে রেডিওতে হিন্দি গান শুনতে শুনতে সিগ্রেট ফুঁকছিল কুদ্দুস। আসরাফ ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে 'পুলিশ তোকে খুঁজছে।'

শুনেই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কুদ্দুস। ঢোঁক গিলে বললে, 'ক্যানে? আমি কী করিচি?'

'শক্তিগড়ে নিতাই হাজরার বাড়ি সাফ করিচিস।'—চাপা গলায় বললে আসরাফ। 'তারপর সেই মাল বেচিচিস বড়গুলে পেল্লাদ সামন্তর কাছে। বুকে হাত দিয়ে বল্ ঠিক কিনা।'

হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল কুদ্দুসের। ঘামতে লাগলো।

আসরাফ ওর ধোপদুরস্ত জামার কলার ধরে বললে, 'তোদের চুরির জ্বালায় যে আমার বাস উঠতে বসেছে। শুধু-শুধু পুলুশের গুঁতো খেয়ে এলুম। চুরি ছাড়তে হবে তোকে।'

'কিন্তু পুলুশ ?'—ঢোঁক গিলে বললে কুদ্দুস।

'সে সামলাবো আমি। আগে বল চুরি ছেড়ে দিবি ?'

'হ্যাঁ ছেড়ে দোব।' —ফিসফিসিয়ে বলেই চারপাশ দেখে নিলে কুদ্দুস।

'কী করিস আজকাল—কাজকাম ?' —জিজ্ঞেস করলে আসরাফ।

'দিন মজুরি।'—জবাব দিলেকুদ্দুস।

'জোটে সব দিন ?'

'নাঃ।'

'বিয়ে করিচিস ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একটা রিক্সা নিয়ে শক্তিগড় বাজারে টান। কিম্বা একটা গরুর গাড়ি—মাল ব'। চুরির ট্যাকা আছে, না উড়িয়েচিস ?'

'আছে।'

'তাহলে লেগে পড়। বাবুদের মত প্যান্ট পরবি অথচ রোজ-গার করবি না—তা তো চলবে না।'

কুদ্দুসের কাছে কথা আদায় ক'রে ফিরলো আসরাফ। কিন্তু কতজনকে কতদিন সামলাবে এইভাবে ? দেশে কাজ-কামের অভাব, কাজ জুটলেও মজুরির অভাব, এদিকে দিন দিন দাম বাড়ে জিনিষের, জলের অভাবে চাষ মার খাচ্ছে —একা আসরাফ কত সামলাবে ?

কুদ্দুস সত্যিই গাড়িতে মাল বওয়া শুরু করলে। চুরি কিন্তু বন্ধ হ'ল না। মাস ছয়েক পরে ঈদ্রিশ মণ্ডলের ঘরেই চোর পড়লো। ঈদ্রিশ কোমরে চাবি বেঁধে বারান্দায় খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। ওর কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে শোবার ঘর ফাঁকা ক'রে দিয়ে গেল চোরে। নেহাৎ ঈদ্রিশ পাকা লোক, তাই সোনার গয়না আর নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। বাকি সব—কাপড়-চোপড় আর বাসন-কোসন

গুটিয়ে নিয়ে গেছে চোর।

ভোরবেলায় খবরটা পেলে আসরাফ হাটতলার বাসষ্ট্যাণ্ডে। কৃষ্ণনগর না গিয়ে সোজা চললো ঈদ্রিশ মণ্ডলের বাড়ি। বড় চুরি, এক্ষনি তদন্ত হওয়া দরকার। ঈদ্রিশের বাড়ির সামনে বিস্তর লোক। ভিড়েব মধ্যে মাথা গলালে আসরাফ। আর কোত্থেকে এসে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো ঈদ্রিশ।

'শালা নেমকহারাম, চোবের রাজা মহাচোর, তোকে আজ শেষই করে ফেলবো।'

এলোপাথাড়ি ঘুসি চড় লাথি চালাতে লাগলো ঈদ্রিশ। আসরাফের মাথার চুল ধ'রে লোহার গবাদে ঠুকতে লাগলো গায়ের জোরে। রক্তে ভেসে গেল আসরাফ। 'আমায় মারছেন ক্যানে? আমি আসরাফ আলি এজ্ঞে, নিবাস এই আটাগড, পেশা ধান-চালের খাটো কাববার এজ্ঞে, আমায় সবাই চেনে, বিশ্বেস করেন হাটতলায় বাস ধরতে যেয়ে শুনলু……'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? অভাবে-অনটনে না খেয়ে না পবে মানুষ শুধু মনের মধ্যে রাগ পোষে। কোথায় আর ঝাড়বে সেই রাগ? সুতরাং আসরাফকে ঘিরে ফেলে সবাই। না খেতে পাওয়া বাঘের মত আসরাফকে ছিঁড়তে থাকে। লাঠি, কোদাল, শাবল, এমনকি লাঙ্গল পর্যন্ত দিয়ে পেটাতে থাকে আসরাফকে। ঈদ্রিশ লাঙ্গলের ফাল দিয়ে নিজের হাতে আসরাফের ভাল চোখটা উপড়ে নেয়।

খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে আসরাফের বৌ, ছেলে মেয়ে। বড় ছেলেটা বাপকে জড়িয়ে ধরে। বুক দিয়ে আটকায়। ঈদ্রিশের হাতে লাঙ্গলের ফাল। সেটা ছেলেটার হাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরায়।

আসরাফ ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়ে। ঈদ্রিশ বলে, 'ও শালা কেউটের জাত, মরে গিয়েও ঠিক বেঁচে উঠবে।'

কুড়ুলের বারি দু-ফাঁক হয়ে যায় আসরাফের মাথা।

ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকে গাঁয়ের লোক। পঞ্চায়েতের বংশী এসে, 'বাপরে! একী ক'রে ফেললে?'—বলে চলে যায়। ঈদ্রিশ নিজেই পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ ভ্যান আসতে ঘণ্টা কতক কেটে যায়। সবাই ভেবেছিল পুলিশ আসার আগেই দিব্যি মাথা জুড়ে গিয়ে আসরাফ পালাবে। কিন্তু আসরাফ ওঠে না। ওর বৌ-ও ওঠে না। হাড় জিরজিরে বাচ্ছাগুলো ওকে লেপ্টে বসে থাকে। আসরাফের বোন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। আসরাফের বড় ছেলে একটা গাছে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে ঠায়।

আসরাফ রক্ত আর কাদার মধ্যে শুয়ে থাকে চুপচাপ। ওর মুখের কাছে মাছি ওড়ে। পুলিশ ওকে আর ওর বড় ছেলেকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

কাটা-ছেঁড়া লাশটা ফেরৎ আসে সন্ধ্যেবেলায়। আসরাফের ছেলে জেলে ঢোকে। আসরাফের বৌ আর বোন অণ্ডাগণ্ডা বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে কোথায় চলে যায়।

তারপর প্রথম কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ফেরে আসরাফ। হাটে বাজারে চায়ের আড্ডায় ঈদ্রিশ মণ্ডলের ঘরের চুরিতে আসরাফের হাত ছিল কিনা এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। এবং এরই মধ্যে গাঁয়ে চুরিও হয়। ছোট-বড় চুরি। কখনো ধান-চাল, কখনো গয়না-টাকা, কখনো গরু-ছাগল।

গাঁয়ের লোক ক্রমশঃ আসরাফকে ভুলে যায়। ওর ছেলে জেল থেকে ছাড়া পেল কিনা বা ওর পরিবার এখন কোথায় থাকে—

কেউ আর মাথা ঘামায় না। মাঝে মাঝে অবিশ্যি আসরাফের সেই কথাগুলো লোকের মনে পড়েঃ আমি আসরাফ আলি গো বাবুরা, নিবাস আটাগড়, পেশা ধান-চালের খাটো কারবার এজ্ঞে।

বছর খানেকের মধ্যে গাঁয়ে ডাকাত পড়ে। চোর নয়, ডাকাত। সোজা ছোরা উঁচিয়ে ঈদ্রিশকে ওঠায়। —'এই শালা দরজা খুলে দে, নইলে ভাঙবো।'

খাটিয়া থেকে উঠে পালাতে চেষ্টা করেছিল ঈদ্রিশ। কিন্তু তার আগেই গরাদের ফাঁক দিয়ে দড়ির ফাঁস এসে লেগেছিল গলায়। মুখ-বাঁধা ডাকাতগুলো ঈদ্রিশকে বেঁধে ওর যথা সর্বস্ব লুঠ করলো। চালের বস্তা পর্যন্ত। হাত পা বাঁধা ঈদ্রিশ ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ও সমানে চেয়ে রইল ডাকাতগুলোর মুখে। সবারই মুখে কাপড় বাঁধা। কিন্তু তবু বোঝা যায় সব কটাই কমবয়সী ছোঁড়া। বিশ-বাইশের বেশি কেউ নয়। একটাকেও যদি সনাক্ত করা যায়…।

দলের মধ্যে ছিপছিপে কালো মতন ছোঁড়া—সেই বোধ হয় পাণ্ডা—এগিয়ে এসে ঈদ্রিশের থুতনি নেড়ে বললে, 'চিনতে পারিস আমায়?'

ঢোঁক গিলে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লে ঈদ্রিশ। ছোরাটা ঈদ্রিশের গলার কাছে ধ'রে ছেলেটা বললে; 'বাপ বেঁচে থাকলে আমিও আজ ধান-চালের কারবার করতুম। কিন্তু তা তোরা হতে দিলি না।' বলতে বলতেই নিজের মুখের কাপড় টেনে খুলে ফেললে সে। 'এই দেখ্। আমি আসরাফ আলির ছেলে আসগর আলি, নিবাস সারা দেশ, পেশা ডাকাতি।'

—হো হো ক'রে অট্টহাসি হাসতে লাগলো ছেলেটা।

ধর্মযুদ্ধ

॥ এক ॥

ধ্বতাং ধ্বতাং ধ্বত্যা-ধ্বতাং। ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাড্ডা-ড্যাডাং। ঢাকের আওয়াজের তালে তালে ওদের ঘাম-ভেজা কালো শরীরগুলো দুলছিল। শক্ত শরীরে যোদ্ধার সাজ। হাতে খাঁড়া, তলোয়ার। সিঁদুর আর ফুল দিয়ে সাজানো তলোয়ারগুলো মশালের আলোয় চকচক ক'রে দুলছে। ড্যাডাং-ড্যাডাং ড্যাড্ডা-ড্যাডাং। ঢ্যাঢাং-ঢ্যাঢাং ঢ্যাঢ্ঢা ঢ্যাঢাং। বাড়ছে ঢাকের আওয়াজ। বাড়ছে যোদ্ধাদের নাচ। মাথার ওপরে খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে ওরা নাচছে আর হুঙ্কার দিচ্ছে। রণহুঙ্কার। ওদের গলার মালা দুলছে। নেচে নেচে উঠছে শিরস্ত্রাণ। বেজে উঠছে কোমরবন্ধ। অস্ত্রে অস্ত্রে ঠুকে আওয়াজ উঠছে ঠকাং ঠং। চমকে উঠছে রাস্তার দু পাশে শ'য়ে শ'য়ে মানুষজন। ওদের রঙ করা মুখ. মুখে ইয়া গালপাট্টা। কপালে লেপ্টানো চন্দন আর সিঁদুর। মাথাভর্তি চুলের জটা লাল গামছা দিয়ে বাঁধা। ওরা ধর্মযুদ্ধে বেরোবার আগে ঘোষাল-ঠাকুর সাজ দেখে বলেছেন—ঠিক আছে।

ধ্বতাং-ধ্বতাং ধ্বত্যা-ধ্বতাং। ড্যাং-ড্যাডা-ড্যাং ড্যাডাং- ড্যাং। বাড়ছে। আরো বাড়ছে ঢাকের বোল। বাড়ছে চিৎকার, বাড়ছে

নাচ। ভর-করা মেয়েমানুষের মাথার এলোচুলের মত ছলে ছলে উঠছে খাঁড়া, তলোয়ার। ঘোষাল-ঠাকুর বলেন, ওরা যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে। শক্র নিপাত করে শক্রর কাটা মুণ্ড হাতে ধর্ম-যোদ্ধারা ভোর রাতে ফিরবে।

ওদিক থেকে ধর্মযুদ্ধের আর একটা দল এসে পড়তেই শিবতলার চাতালে দাঁড়িয়ে শম্ভু মোড়ল চিৎকার করে মন্ত্র উচ্চারণ করছে ঃ

হাতে ত্রিশূল রাঙ্গালাঠি, পরিধানে বাঘের ছাল।
জাগ্‌বে জাগ্‌বে ভাই সত্যের কোটাল ॥

দুদল এখন পাশাপাশি নাচছে। যেন রেষারেষি। খাঁড়া, তলোয়ার ঘুরছে মাথার ওপর। বুক-কাঁপানো আওয়াজ উঠছে এক শ' গলায় ঃ জাগ্‌রে জাগ্‌রে ভাই সত্যের কোটাল। নাচতে নাচতে নিজেদেরই তলোয়ারের খোঁচায় কারোর গলা থেকে কাগজের মালা খ'সে লুটোচ্ছে মাটিতে। কারোর মাথার শোলার শিরস্ত্রাণ খুলে পড়ছে, কোমর থেকে ঘুঙুর পড়ছে ছিঁড়ে। ওদের শরীরে মাখানো ছাই আর সিঁদুর ঘামের সঙ্গে গড়াচ্ছে নীচে। হ্যাজাগের আলো পিছলে চোখে বেঁধে।

গ্রামের পথ ধ'রে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে ধর্মযুদ্ধের সন্ন্যাসীরা।

সুজয় সামন্তর ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানের আলো ঝলসে উঠলো যোদ্ধাদের রঙ-করা মুখে।

॥ দুই ॥

সন্ন্যাসীদের দল শ্মশানের দিকে এগিয়ে গেলে পর শিবতলার চাতালে দাঁড়িয়ে শম্ভু মোড়ল বললে, 'হ্যাঁর্যা পঞ্চা, খুদেকে ত নাচতে দেখনু না।'

'ক্যানে, ছেল ত খুদে।' —পঞ্চা, নিজের রঙ-করা মুখে একটা বিড়ি গুঁজে জবাব দিলে।

'ছেল, কিন্তু ডাঁইরে (দাঁড়িয়ে) ছেল শুধু। নাচ-কোঁদ করে নাই। কী ব্যাপার বল দিকিনি?'

'এবার গাজনে ওর মতি নাইকন (মন নেই)।'—পঞ্চা মাথা থেকে গামছা খুলে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বললে।—'পেথম হতিই মিইয়ে আচে। কিচ্ছুতিই (কিছুতেই) সন্নিসি হবে না, আমি জোর ক'রে ওকে বেত্তো কইরেচি; হবিষ্যি কইরেচি (করিয়েছি)।'

'ক্যানে ক্যানে? হলোটা কী ওর? ফি বছর আস্ত মাথা এনে নাচায়, এবারে ওর হলো-টা কী?'

'খুদের ঘরে অসুক-বিসুক। বউ দাস্ত বমি কচ্চে। বাপের পেট ফুলে জয়ঢাক। —এ্যাকন যায় ত্যাকন যায়।'

'তাই বলে গাজন করবে না? শ্মশান-জাগাবে না?'—শম্ভু অবাক হয়ে বললে, সম্বচ্ছরের এই একবার বাবা ঈশানেশ্বরের গাজন, ঘৃণি-রামরা সাত-পুরুষ শ্মশান-সন্ন্যিসি। তার ছেলে হয়ে কিনা...... খুদেকে একবার ডেকে দিস দি কনি।'

'আচ্ছা, দোব।'

পঞ্চা চলে যাচ্ছিল। শম্ভু মোড়ল আবার ডাকলে।

'হ্যাঁ র‍্যা পঞ্চা, এবার মাথা কেমন আসবে র‍্যা?'

'সবই ত খটখটে খুলি।' —পঞ্চা জবাব দিলে।—'গোটা মাতা আর মিলচে কোতা? মোচনমানেরা দিনরাত কবর পাহারা দিচ্চে কিনা......।'

'বড্ড বাড় বেড়েছে নেড়েদের।'—শম্ভু ফোঁস করে উঠলো। 'দুশো আড়াইশো বছর ধ'রে বাবা ঈশানেশ্বরের গাজনে নরমুণ্ড নাচায় সন্ন্যিসিরা। কস্মিন কালেও কেউ শোনেনি মোচনমানেরা কবর

পাহারা দেয়। আসলে রাজনীতি-ওয়ালারাই সাহস বাড়িয়েছে শালাদের।'

'তা ত বটিই।'—পঞ্চা সায় দিলে।

'দেখিস যদি টাটকা মাথা রাতারাতি কিছু মেলে। আর খুদেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার পাঠাস, বুঝলি?'

'দেকি ওকে বলে কয়ে।'

অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সন্ন্যাসীদের দল। পঞ্চা দৌড়োতে লাগলো।

॥ তিন ॥

'জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়, জয় বাবা গাজনেশ্বরের জয়।'—দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের আওয়াজ। গাঁয়ের পথে হাজার মানুষের ভিড়। ভিড়ের ভেতব দিয়ে খানিক দৌড়েই খুদের সঙ্গে দেখা।

'এ্যা খুদে চললি কোতা?'

'ঘব।'

'ঘর যাচ্চিস!—শ্মশান যাবি না!'

'নাঃ।'—ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে খুদে।

'সে কি র‍্যা? বেত্য কল্লি, হবিষ্যি কল্লি, শিবতলায় বাবা ঈশানেশ্বরের স্বমুখে দাড়ি কামালি, আর এখন বলচিস ঘর যাচ্চি।'

'ঘরেতে অসুক, বাপ যায় যায়।'

'সবই ত বাবা ঈশানেশ্বরের ইচ্ছে র‍্যা।—বাবার নামে চাঙ্গা হ…।'

'ধ্যাৎ' ভাল্লাগে না। ঘরেতে অভাব, হাঁড়ি চড়ে না…।'

'অমন কতা কস না খুদে,'—পঞ্চা খুদের হাত ধরলে।—

'অমন কত্তা কইলেও পাপ। অভাব আচে ব'লে গাজন করবি না? চোত মাসেতে কার ঘরেতে আর অভাব নাই বল দিকিনি? শম্ভুদা পই পই ক'রে বলেচে তোকে শ্মশান জাগতিই হবে।'

খুদে কোন জবাব দিলে না। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো শুধু।

'চাঙ্গা হ, বুজলি খুদে'। পঞ্চা বললে, 'বাবা গাজনেশ্বরের নামে চাঙ্গা হ। দুঃখ-কষ্ট রোগ বালাই দূর হবে।'

খুদে এখনো চুপ। পঞ্চা ওর কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে বললে, 'চ চ, শ্মশান চ। শ্মশান জাগাতে হবে।'

'আগে ওদের পিণ্ডির জোগাড় তো করতে হবে।'—

—ফোঁস ক'রে উঠে বাড়ির পথ ধরলে খুদে।

পঞ্চা পেছন থেকে বললে, 'তড়িঘড়ি আসিস কিন্তুন শ্মশানে। শম্ভুদা বলেচে তোকে দেকা করতে।'

খুদে আর সাড়া দিলে না। পঞ্চা শুনলে দূরে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের আওয়াজ:

হাতে ত্রিশূল রাঙা লাঠি পরিধানে বাঘের ছাল।
জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল॥

আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলে পঞ্চা। চিৎকার ক'রে হাঁকলে: 'জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়, জয় বাবা গাজনেশ্বরের জয়।'

তারপর দৌড়োতে লাগলো শ্মশান-মুখো।

॥ চার ॥

বাড়ি ফিরেই তুলসী-তলার পাথরটার ওপরে গুগলি-শামুক ঢেলে ভাঙতে বসলে খুদে। ঠক্ ঠক ঠকাং। ঠক্ ঠক্ ঠকাং।

টিম টিম ক'রে লম্ফ জ্বলছিল। চালাঘরের দাওয়ায় একটুখানি

আলোয় খাটিয়াটা দেখা যায়। দড়ির খাটিয়ায় পাশ ফিরে ঘৃণিরাম বললে 'ক্যা র‍্যা? খুদে নিকিন?'

'হুঁ।'—

'তুই ঘর এলি। শ্মশান জাগাবি না?'

'না ঃ।'—ছোট্ট জবাব দিয়ে মড়মড়িয়ে শামুকের মাথা ভাঙতে লাগল খুদে।

'সি কি র‍্যা?'—বুড়ো এত অবাক যেন ভূত দেখছে। কুমড়ো ফোলা তলপেটটা আঁকড়ে খাটিয়ায় উঠে বসার চেষ্টা করেই ধপাস ক'রে শুয়ে পড়লো। 'আজ সাত পুরুষ আমরা শ্মশান জাগাই, মাতা নাচাই…তোর মাতা জোগাড় হয়নি খুদে?'

'নাঃ'।—ব'লে পেল্লায় একটা শামুকের মাথা পাথরের এক ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিলে খুদে। 'পেটে ভাত নাই, মাতা নাচানো!'

'বলিস কি র‍্যা খুদে?'—বুড়ো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। 'তুই থাইলে মাতা নাচাবি নাই ঠিক করিচিস। আমাদের সাত-পুরুষের গাজন · হা ভগবান।'

বুড়ো কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে কী বলছে বোঝা যায় না। খুদে উঠে দাঁড়ালে। চালা ঘরের দাওয়ায় উঠে এসে খাটিয়ার ওপর ঝুঁকে দেখলে বাপকে। ফোলা তলপেটটায় আলতো হাত বুলিয়ে বললে, 'হাঁসপাতালে থাকলিই ভাল কত্তি বাপ, লিবারের অসুক, ক্যান যে মত্তে ঘর এলি…।'

'বাবার গাজনে হাঁসপাতালে প'ড়ে থাকতে বলিস্ তুই'—আঁৎকে উঠলে বুড়ো। 'হারামজাদা, খচ্চর, পালা একান হতে, পালা। দূর হ চোকের সামনে হতে।'

ধমক খেয়ে উঠানে নেমে এল খুদে। ওদিকে শোবার ঘরের দাওয়ায় ওয়াক ওয়াক শব্দ। বাঁশের খুঁটি ধ'রে বমি করছে বৌ।

খুদে এগিয়ে গিয়ে বৌ-কে ধরলে। বমি করতে করতে এলিয়ে পড়েছে মেয়েমানুষটা। খিদের জ্বালায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দাস্তবমি। খুদে বৌ'কে জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালে মেঝেয়। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। ব'সে ব'সে জুলজুল ক'রে চেয়ে আছে বড় মেয়েটা। একটা তালপাতার পাখা মেয়েটার হাতে দিয়ে খুদে বললে 'তোর মায়ের মাতায় এটুন হাওয়া কর দিকিনি।'

'থাক্ আর সোহাগ্ দেকিয়ে কাজ নাইক'ন।' —মরতে মরতেও মুখ ঝামটা দিচ্ছে বৌ। 'বাবার গাজনে শ্মশান জাগাবে না,—বেরোও বেরোও।'

আবার শ্মশান জাগানোর কথা। তেলে বেগুনে জ্ব'লে উঠলো খুদে।

'আমি শ্মশান জাগালে পিণ্ডির জোগাড়টা করবে ক্যা? ছেলে-মেয়েগুলোকে, কি শ্মশানে পাটাবো নিকিনি?'

—'বলেই উঠোনে নেমে গামছা-বাঁধা শামুকে একটা লাথি কষিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল খুদে।

॥ পাঁচ ॥

শিবতলার ওদিকটায় মেলা বসেছে। বিজলি আলোয় দিব্যি জমজমাট মেলা, যাত্রাপালার আসরে ভিডিও শো। এদিকে শিব মন্দিরের দুপাশে দুটো মাচানের নীচে মানুষের মেলা। পেল্লায় বাঁশের কাঠামোতে মাটির ঠাকুর সাজানো—হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, বালি-সুগ্রীবের লড়াই, মহাদেবের জটায় গঙ্গা, তাড়কা রাক্ষসী বধ, শিবের দক্ষযজ্ঞ।

মাচানের পেছনে ঘুপচি অন্ধকারে ব'সে বিড়ি টানছিল খুদে, শম্ভু মোড়ল চাতাল থেকে ডাকলে: 'কে র‍্যা? খুদে না? শোন্

শোন্ ইদিকে আয়।'

বিড়ি ফেলে কাছে এগিয়ে এল খুদে।

'এই দেখুন ঘোষাল জ্যাঠা, খুদে শ্মশানে না যেয়ে এইখেনে ব'সে ব'সে মাচানে থাকা দেওয়া ছবি দেখছে।'

খুদে মাচানের দিকে তাকালে। অনঙ্গ ঘোষাল সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হলো খুদে? তোদের সাত পুরুষের গাজন, তুই শ্মশান জাগাবি না? মাথা নাচাবি না?'

'কী করবো ঠাকুর?'—খুদে মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে মিনমিন করলে।—'চোত মাসটা বড্ড কষ্ট যাচ্ছে, কাজ কাম নাই। ঘরেতে অসুক, অভাব, হাঁড়ি চড়ে না।'

'অভাব আর কার ঘরে নেই রে? অভাব আছে, অসুখ আছে বলেই না বাবার গাজন।' —ঘোষাল বললেন 'তোরা হলি গিয়ে বাবা মহাদেবের চ্যালা। তোদের নিয়েই তো বাবা শ্মশান নেত্য করেন। শ্মশান নেত্য মানে অভাব-অনটন রোগ-শোকের সঙ্গে লড়াই—যুদ্ধ—এটা বুঝিস না?'

'যুদ্ধ?'—অবাক হয়ে বিড়বিড় করলে খুদে?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, যুদ্ধ—ধর্মযুদ্ধ। শিবতলায় তোদের নাচন-কোঁদন মানে বাবার শ্মশান নাচ। যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছিস তোরা, বুঝলি?—ধর্মযুদ্ধের সেনা তোরা এক একজন সন্ন্যাসী'।

হাঁ করে ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে ছিল খুদে। বশীকরণ করা মানুষের মত বিড়বিড় করলে: 'কী বলচেন এজ্ঞে ঠাকুর মশয়?'

'ঠিকই বলছি রে। আড়াইশ তিনশ বছর আগে এ গাঁয়ে তোদের ঠাঁই ছিল না। ছিল শুধু মোচনমানের বাস। যুদ্ধ না করলে তোরা টিকতে পারতিস?'

'কিন্তুন ঠাকুর, ঘরে ভাত নাই। ছেলে-মেয়ে শুকিয়ে থাকে,

গাজন কত্তে আর ভাল্লাগে না।'

'অমন কথা মুখে আনিস না খুদে।' —শম্ভু মোড়ল বললে, 'শুনলি না ঘোষাল-জ্যাঠা বললেন এটাই লড়াই, এটাই যুদ্ধ।'

'লড়াই-ই-তো করছি সাবা জেবন!'—খুদে শব্দ করে শ্বাস ফেলে বললে সংসারের লড়াই কত্তে কত্তেই তো শ্যাষ হ'য়ে গেনু।'

খুদে আবও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাব আগেই হৈ হৈ ক'রে এসে পড়লো সুজয় সামন্ত। সঙ্গে সিনেমাব হিরো হিরো চেহাবাব জন কয় কলকাতার বন্ধু।

'দেখি দেখি। সামনে থেকে সর তো।'—বলতে বলতেই মন্দিবের চাতালে উঠে পড়লো সুজয়। ক্যামেরা তাক ক'বে বললে, 'শম্ভো, তুই শিবলিঙ্গটা হাতে নিয়ে একটু দাঁড়া তো এইখানে,—বছবেব এই কটা দিন তুই-ই তো বামুন,—তোর একটা ছবি নোব। রোববারের ইংরাজী কাগজে তুই কালারে ছাপা হবি।'

সুজয়ের সামনে শিবলিঙ্গ হাতে হাসি হাসি মুখে দাঁড়ালো শম্ভু মোড়ল, পাশে অনঙ্গ ঘোষাল।

ফ্ল্যাশ বাল্বেব আলোয় ঝলসে উঠলেন বাবা গাজনেশ্বর।

॥ ছয় ॥

খড়ি নদীর ধারে অন্ধকাব শ্মশান, ঝোপজঙ্গল। চারপাশ শুনশান। এগোতে এগোতে মন্ত্রপাঠ শুনতে পেলে খুদে:

'নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বহমা খট্টার মাঝ,
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে
প্রভু দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি,
অন্য দেব কোনখানে লাগে?'

পায়ে পায়ে শ্মশানে ঢুকলে খুদে। অন্ধকার ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে

ফাঁকে টিমটিম আলো। ধূপ-ধুনো জ্বেলে মাটির তলা থেকে নরমুণ্ড বার ক'রে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজোয় বসেছে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা।

'পঞ্চা, এ্যা পঞ্চা।' —খুদে ডাকলে। কেউ সাড়া দিলে না। শ্মশানে অনেক সন্ন্যাসী। তাদের ভেতর পঞ্চাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো খুদে। ওকে পাওয়া গেল নদীর কোলে। দুর্গন্ধ একটা খুলির সামনে হাঁটু গেড়ে ও পুজোয় বসেছে ঃ

'চন্দনচর্চিত, কুমকুমকায়

চারু জটাজুট হোমপবিত্র, ধূলায় ধূসর তনুস্তং,

প্রণমামি সদাশিবং পাপহরণম্॥'

খুদে কাছে যেতে পঞ্চা মুখ তুলে চাইলে।

'তুই এইচিস খুদে। জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়।'—পঞ্চা বললে, 'মাটির তলায় খুলি পোঁতা আচে, বের করে পুজো সেরে নে।'

খুলি?'—নাক সিঁটকে খুদে বললে।

'হ্যাঁ, দখ-না বাড়তি খুলি পোঁতা আচে। শ্মশান কেনার সময় যারা সন্নিসি হবে বলেছেল তাদের ভিদরি কজনার ওলাউটো হয়েচে, তাই আসে নাই। ওদের মাথা একটা তোল।'

'নাঃ।'—ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেললে খুদে।

'থাইলে কী করবি?'—পঞ্চা অবাক।

'নাচাতে যদি হয় মাংস-শুদ্ধ আস্ত মাতা নাচাবো। খটখটে খুলি কোনদিন নাচিয়েচি আমি? দ্যাঃ, একটা কোদাল-টাকনা কিছু দ্যা।'

কোদাল নিলে খুদে। আর একটা খাঁড়া। কাঁধে ফেলে খড়ি নদীর ওপরে বাঁশের পুল পেরিয়ে হনহন ক'রে হেঁটে অন্ধকার ধান-ভুঁইয়ে নেমে গেল।

অন্ধকারে ওর দিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে বসে রইল পঞ্চা।

চারপাশ থেকে মন্ত্রপাঠের আওয়াজ উঠছে ঃ

প্রভু দেব ত্রিলোচন বিঘ্ন কর বিমোচন
নরের শকতি।
তোমার ভক্তেরে দাও ধর্মযুদ্ধে মতি ॥

॥ সাত ॥

দেওয়ানদিঘি গাঁয়ের কোলে যখন খুদে পৌঁছুলে তখন ওর পা টলছে। নিশুত রাত। চারপাশে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার খাঁ খাঁ মাঠ। কারবালাটা গাঁয়ের কিনারে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মাটির তলায় পরপর শুয়ে আছে মরা মানুষ।

খুদে দেশলাই জ্বাললে। ফুস্ ক'রে নিভে গেল হাওয়ায়। আবার জ্বাললে। দুহাতে আগুন আড়াল ক'রে হেঁটে বেড়াতে লাগলো কবরের ওপর। এই তো ঝুরো মাটি দু-এক দিনের মধ্যেই মড়া পুঁতেছে কবরে।

চারপাশ এক নজর দেখে নিয়েই হুপহাপ কোদাল চালাতে লাগলো খুদে। আলগা মাটি তুলে ফেলতে দেরি হ'ল না। ভেতরে দুর্গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠছে। খুদে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরালে। তারপর আগুনটা দুহাতের মধ্যে নিয়ে মরা মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো।

'ইস্‌স্!'—ওর হাত কাঁপছে। পা কাঁপছে। মাথার মধ্যে শিবের নাচন। দক্ষযজ্ঞ। মরা মানুষটার এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। টানা টানা চোখ। গলায় কাটা দাগটা অব্দি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই তো মাত্র তিন দিন আগে খড়ি নদীর জলে পড়ে ছিল গলাকাটা আইনুল! কুড়মুনে বাবা গাজনেশ্বরকে যেদিন পালকি করে গাঁ ঘোরানো হচ্ছে সেদিন পাড়ুই-এর কোলে গিয়ে দেখে এসেছিল খুদে ঃ

ঝাঁকড়া চুল গলা-কাটা ছেলেটাকে।

আঙ্গুল পুড়িয়ে দেশলাই কাঠিটা নিভে গেছে। খুদের মাথার মধ্যে সব তালগোল। ক্ষেত-মজুরদের মজুরি-বাড়ানো নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল গাঁয়ে গাঁয়ে। তল্লাটের যত চাষাভূষো সব ধর্মঘট করেছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে হয়েছে মিছিল। আর মাঝখানেতেই এই টানা টানা চোখ, ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা—সেখ আইনুল। পাঁড়ুই-এ ভূষণ সামন্তর জমিতে চাষের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কাজে যায়নি। জ্যাঠার বাড়িতে এসে সুজয় সামন্ত বলেছিল, 'আমাদের গাঁয়ে তো এসব ঝামেলা নেই। সামনে গাজন নিয়ে দিব্যি মেতে আছে লোকে।' ভূষণ সামন্ত সাফ বলে দিয়েছিল, মজুরি বাড়বে না এক পয়সাও, মজুরি বাড়ানোর আব্দার করলে বিহার থেকে লোক আনিয়ে চাষে লাগানো হবে। তারপরই ঘটনাটা। পাঁড়ুই এর কোলে খড়ি নদীর জলে ভাসতে লাগলো ঝাঁকড়া চুলের প্রকাণ্ড মাথাটা—এই আইনুল।

ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেললে খুদে। এতটুকুন ছেলে। বছর বিশ-বাইশের বেশি নয়। কারা তোকে লড়াই-এ হারাল রে ?

হঠাৎ কটা টর্চের আলো। সোজা এসে পড়েছে খুদের মুখে।

'কে র‍্যা ?' কবর খোঁড়ে কোন্ কাফের ? —শালা গাজন-সন্ন্যিসি।'

ধুপধাপ দৌড়ে আসছে লোকগুলো। এক লাফে আইনুলকে ডিঙ্গিয়ে খুদে দৌড়োতে লাগলো।

॥ আট ॥

দৌড় দৌড়। প্রাণপণ দৌড়োচ্ছে খুদে। ওর মাথার মধ্যে ভোঁ ভাঁ। পা পড়ছে এলোমেলো,—এক্ষণি বুঝি হুমড়ি খেয়ে

পড়বে। আইনুল আইনুল! কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল আইনুল? কিসের সঙ্গে? কবরের নীচে এক ফালি লাল কাপড় বুকে নিয়ে আইনুল শুয়ে আছে, ধর্মযুদ্ধে কি হেরে গেছে সে?

আহা! কবরের মধ্যে বড় একা একা শুয়ে আছে ছেলেটা। মুখখানা বড় মায়া-মায়া। আইনুলের মুখ এখন দিগন্ত জোড়া মাঠ হয়ে, কালো আকাশ হয়ে চোখের সামনে। অন্ধকার ধান ভুঁই-এর ওপর দিয়ে খুদে দৌড়োচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়োতে শ্মশানের কোল। শ্মশানকে পাশ কাটিয়ে ও উঠলো গাঁয়ের পথে। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে তুলসীতলায় উঠোনে বসেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ওদিকে চালাঘরের দাওয়ায় লম্ফের আলো। ঘূণিরামের খাটিয়া ধরে বসে আছে বৌ। লম্ফ ধরে জুলজুল করে দেখছে মেয়েটা।

'কী হয়েচে? কী হয়েচে?'—একরকম টলতে টলতে দাওয়ার খুঁটি ধরে ওপরে উঠল খুদে। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস টানছে ঘূণিরাম চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ফোলা তল-পেটটা দুহাতে আঁকড়ে ছটফট করছে মানুষটা।

'কী হল বাপ, কষ্ট হচ্চে?'

বুড়ো কোন জবাব দিলে না।

'তুমি যাওয়ার পর……'—ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিড়বিড় করলে বৌ। লম্ফের কাঁপা কাঁপা আলোয় খুদে দেখলে মেয়ের গাল বেয়ে গড়াচ্ছে জল।

'বনন্ হাঁসপাতালে থাকতে…'অস্থির হয়ে উঠলো খুদে। বাপের মুখের ওপর ঝুঁকে তলপেটে হাত দিয়ে বিড়বিড় করলে, 'এত রেতে ওষুদ কোতা পাই? …সামন্তবাবুকে ব'লে কয়ে রেতের মতন ওষুদ যদি…'

ঘুণিরাম এবার পিটপিট ক'রে চাইলে। কাঁপা কাঁপা গলায় গোঙাতে গোঙাতে বললে, 'তুই···শ্মশান···জাগাস নাই খুদে? হা ভগবান······।'

খুদের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। মাথার মধ্যে চিনচিনে জ্বালা। যেন খাঁড়া দিয়ে মগজ ফালাফালা করছে কেউ।

'তোমার এই অবস্থা, আমি শ্মশান-জাগাবো?'

'তোর জন্যিই, হ্যাঁ তোর জন্যিই···'—কথা জড়িয়ে গেল ঘুণিরামের। টসটস ক'রে জল গড়াতে লাগলো ওর গাল বেয়ে।

এক লাফে দাওয়া থেকে নেমে খুদে রাস্তায় বেরোল।

॥ নয় ॥

শিবতলা শুনশান। মাচানের ছবি দেখার কেউ নেই। মাচানের পাশ দিয়ে এক দৌড়ে সামন্ত-বাড়ি। চারপাশ অন্ধকারের মধ্যে পেল্লায় সাদা বাড়িটা কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে। লোহার ফটকের ফাঁক দিয়ে অনেকখানি উঠোন দেখা যায়। উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় চোর তাড়াবার বিজলী আলো জ্বলছে। দোতলার বারান্দাতেও আলো। জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে, সব বন্ধ।

'বাবু, বাবু।'—চিৎকার করে ডাকলে খুদে। কোন সাড়া নেই। ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকছে রাস্তার কুকুরগুলো।

'বাবু, বাবু। সামন্তবাবু।'—বার বার ডাকলে খুদে। ডাকতে ডাকতে ঘুরতে লাগলো বাড়িটার দেওয়াল ধ'রে চার পাশ। কুকুরগুলো সমানে ডাকছে।

তেতলার জানালা দিয়ে জোরাল টর্চের আলো এসে পড়লো ওর মুখে।

'কে রে? এত রাতে কী?'—সুজয় সামন্তর গলা।

'বাপের গতিক খুব খারাপ বাবু। খুব কষ্ট পাচ্ছে নিঃশেষ টানতেও কষ্ট। একবার যদি……'

'এত রাতে পচাই মদ গিলে গিলে বেসামাল। কাল সকালে আসিস,—যা ঃ।'

গাঁয়ে ডাক্তার বলতে এই একজনই—সুজয় বাবুর বাবা। এত রাতে কোথাও যান না. কিন্তু সুজয়বাবু কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। তাই খুদে বললে. 'দাদাবাবু. আপনি একবারটি যেয়ে……নিদেন-পক্ষে একটু-ওষুদ-বিষুদ……।'

দড়াম্ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

পেল্লায় বাড়িটার দেয়াল ধ'রে ধ'রে ঘুরতে ঘুরতে আরও বার কয় ডাকলে খুদে। তারপর ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লো পথের ওপর। বাড়ির ছাদে টি ভি ছবির লম্বা লম্বা লোহার শিক। বাবুরা বলে এ্যাণ্টেনা। ওটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খুদে। তারপর উঠে আবার দৌড়াতে লাগলো। রায় বাড়ি, মণ্ডল বাড়ি, কোঙার বাড়ি, চাটুজ্জে বাড়ি—কোন দরজাই খুললো না। অনঙ্গ ঘোষাল বোধ হয় জেগেই ছিলেন। বৃত্তান্ত শুনে বললেন, 'বাবা ঈশানেশ্বরের অযত্যেদে করিচিস। আমি কী করবো বল ?'

খুদে আবার দৌড়োলে। শিবতলার চাতালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমি আর যুদ্ধ করতে পাচ্ছি না বাবা! দয়া কর।'

॥ দশ ॥

মন্দিরের দরজা বন্ধ। চারপাশ শ্মশানের মত থমথম করছে। কিন্তু এ কী? কিসের যেন আওয়াজ? দূর থেকে হৈ চৈ-এর

শব্দ। খুদে উঠে ঘরমুখো ছুটলে।

লম্ফের আলোটা দপদপ করছে। মেয়েটা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বৌ কাঁদছে। বিড়বিড় ক'রে প্রলাপ বকছে বাপ।

'কেউ না নাচাক, আমি নাচাবো মাতা।···জাগ্‌রে জাগ্‌রে ভাই সন্তোষ কোটাল।·'

বুড়োর জড়ানো কথা কান পেতে শুনলে বোঝা যায়। একই কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছে ঘৃণিরাম। দুচোখ থেকে টসটস ক'রে নামছে জল। ভিজে যাচ্ছে মুখের খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। বাই'র রাস্তায় ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ। ছুটছে লোকজন। দূর থেকে ভেসে আসছে হৈ চৈ চিৎকার। ঘৃণিরাম সমানে বিড়বিড় করছে: 'জাগরে জাগরে ভুইে সন্তোর কোটাল।'

'কতা কয়ো না বাপ, চুপ থাকো।'—খুদে গামছা দিয়ে বাপের চোখের জল মোছাতে লাগলো।—'এট্টুন পরে ভোর হলে ডাক্তার-ঘর হ'তে ওষুদ এনে দোব। তুমি ভাল হ'য়ে যাবে। আমি সুজয় দাদাবাবুকে ব'ল এইচি।'

'প্রভু দেব ত্রিলোচন ·····বিঘ্ন কর বিমোচন ·····নরের শকতি, তোমার ভক্তেরে দাও · ধর্মযুদ্ধে মতি।···'—জড়ানো গলায় আউড়ে যাচ্ছে ঘৃণিরাম। বাপের মুখে ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে কথা-গুলো খুদের মুখস্থ। শ্মশান-সন্ন্যাসী হলেই সে ধর্মযুদ্ধের কথা আওড়ায়। শম্ভু মোড়ল, ঘোষাল-ঠাকুর সবার মুখেই এক কথা: ধর্মযুদ্ধ। সন্ধ্যেবেলায় ঘোষাল ঠাকুর বললেন, 'ধর্মযুদ্ধে বেরিয়ে সন্ন্যাসীরা ভোরবেলায় ফেরে শত্রুর কাটা মুণ্ডু নিয়ে। কিন্তু কার সাথে যুদ্ধ?

খুদের চোখের সামনে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আকাশ-জোড়া আইনুলের মুখ।

'কার সাথে যুদ্ধ? ধর্মযুদ্ধ কার সাথে?'

খুদের মুখে হাত চাপা দিলে বৌ। কিন্তু ওর যে মাথার মধ্যে প্রলয় নাচন। দক্ষযজ্ঞ। এত যুদ্ধ চারপাশে। কিন্তু কার সাথে?

'জয় বাবা ঈ-শা-নে-শ্ব-রে-র...'

—মাথাটা একবার একটু তুলেই ধপ ক'রে খাটিয়ায় পড়ে গেল ঘৃণিরাম। তারপরই পাথরের মত চুপ। আইনুলের চোখের মত স্থির হয়ে গেছে ঘৃণিরামের দৃষ্টি।

ডুক্‌রে কেঁদে উঠলে বৌ। চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলে মেয়েটা। টলমল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল খুদের ছোট ছেলে। আঁ-আঁ ক'রে গোঙাতে লাগলো খুদে। দুহাতে নিজের মাথার চুল ধ'রে ছিঁড়তে লাগলো। উঠোনে নেমে লাফাতে লাগলো পাগলের মত। ঠাকুরে ভর-করা মেয়েমানুষের মত মাথা ঠুকতে লাগলো মাটিতে। শামুক ভাঙা পাথরটাকে তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলে তুলসী-মন্দিরে। তারপর ঝড়ের মত বার হ'ল রাস্তায়।

॥ এগার ॥

রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটি। পাগলের মত দৌড়োচ্ছে সবাই। কারো কারো হাতে লাঠি, সড়কি, গাঁইতি, খাঁড়া। শ্মশানের দিকে হৈ-হল্লা চেঁচামেচি। বন্দুকের আওয়াজ।

শ্মশানের পাশ দিয়ে খড়ি নদীর পুল পেরিয়ে চলেছে মানুষ। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা চলেছে নাচতে নাচতে। চিৎকার করে গাইছে :

'হাতে ত্রিশূল রাঙা লাঠি পরিধানে বাঘের ছাল।
জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল ॥'

বন্দুক হাতে চলেছে সুজয় সামন্ত। খড়ি নদীর জলে রক্ত।

খুদে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে দেখছে, কিন্তু বুঝছে না কিছু। 'জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়। জয় বাবা গাজনেশ্বরের জয়।'—আওয়াজ দিচ্ছে সন্ন্যাসীরা। মাথার ওপরে খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে লাফাচ্ছে। হ্যাজাগের আলোয় ওদের তলোয়ার চকচক করছে।

গুড়ুম গুড়ুম। বন্দুকের আওয়াজে চিরে যাচ্ছে আকাশ। কেঁপে উঠছে অন্ধকার ধান-ভুঁই। দেওয়ানদিঘি ঢুকতেই সেই কারবালা। যারা শ্মশান অব্দি ধাওয়া করেছিল তারা সব পালিয়েছে। 'জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল—' গাইতে গাইতে সন্ন্যাসীরা কোদাল আর গাঁইতি দিয়ে তুলে ফেলছে কবরের মাটি। উঠে আসছে একের পর এক পচা গলা দুর্গন্ধ মড়া। তলোয়ারের এক কোপে কাটা হচ্ছে মুণ্ডুগুলো।

'জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়। জয় বাবা গাজনেশ্বরের জয়।'—ভার রাতের শুনশান অন্ধকার চিরে আওয়াজ দিচ্ছে শয়ে শয়ে লোক। এক একটা মুণ্ডুর চুল ধ'রে হাতে তুলে নিচ্ছে এক একজন সন্ন্যাসী। তারপর সবাই ফিরে আসছে গাঁয়ের শ্মশানে।

খড়ি নদীর পুলে দাঁড়িয়েছিল খুদে। চিৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে ওরা যখন ফিরে আসছে, ও তখন পেরোতে লাগলো।

'জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল।'—শত গলায় আওয়াজ উঠছে। আর সন্ন্যাসীদের হাতে হাতে মাথাগুলো দুলছে। মাঠের আল ধ'রে এগিয়ে আসছে ওরা। ডান হাতে মাথার ওপরে খোলা তলোয়ার, আর বাঁ হাতে নরমুণ্ড। গ'লে গ'লে খ'সে খ'সে পড়ছে পচা মাংস। শম্ভু মোড়ল চিৎকার ক'রে আওড়াচ্ছে:

'প্রভু দেব ত্রিলোচন বিঘ্ন কর বিমোচন

নরের শকতি।

তোমার ভক্তেবে দাও ধর্মযুদ্ধে মতি।'

মিছিল ক'বে আসছে সন্ন্যাসীরা, সবার সামনে পঞ্চা। পঞ্চা হাসছে। নাচছে লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে: 'জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল।'

পঞ্চার হাতে আইনুলের মাথা!

—হ্যাজাগের আলোয় স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে সেই টানা টানা চোখ ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা,—সেই আইনুল!

কোন্ যুদ্ধেব বলি হলি রে তুই?

মাথার মধ্যে চিনচিনে জ্বালা নিয়ে, চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে খুদে দেখলে সুজয় সামন্ত বন্দুকটা কাঁধে ফেলে ক্যামেরা তাক করছে।

মিছিলেব সামনে পঞ্চাকে দাঁড় কবিয়ে বললে, 'আইনুলের মাথাটা একটু তুলে ধর! শালা লড়াইয়ে নেমেছিল! লড়াই! যুদ্ধ! বিপ্লব! হেঃ।'

ফ্ল্যাসগানের আলো ঝলসে উঠলো গলা-কাটা আইনুলের মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়োতে শুরু করলো খুদে।

॥ বার ॥

দৌড় দৌড় দৌড়। তাড়া খাওয়া জন্তুর মত দৌড়োচ্ছে খুদে। দৌড়োতে দৌড়োতে শিবতলা। মাচানের চারপাশ। মন্দিরের চাতালে মাথা খুঁড়ছে খুদে পাগলের মত। দুহাতে মাটি আঁচড়ে তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে শিবমন্দিরের দরজায়। সেখান থেকে দৌড়ে ঘর। খাটিয়ায় মরা মানুষটাকে ঘিরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে বৌ আর মেয়ে।

ভোর। শ্মশানের দিক থেকে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে সন্ন্যাসীরা। সঙ্গে শয়ে শয়ে মানুষ। সাঁঝের বেলায়

যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে ছিল ওরা, এখন যুদ্ধে জিতে শত্রুর কাটা মুণ্ড হাতে ফিরছে। কিন্তু কে শত্রু?

'কে শত্রু বাপ?' —খাটিয়ার ওপরে ঝুঁকে মরা ঘুণিরামের মুখের কাছে মুখ এনে চিৎকার করলে খুদে।—'বল বাপ কে শত্রু? যুদ্ধ কার সাথে?'

সবাই নিথর। বৌ মেয়ে ভয় ভয় চোখে দেখছে খুদেকে। দুহাতে মাথার চুল টানতে টানতে মাথা ঝাঁকিয়ে খুদে সজোরে ঠুকতে লাগলো খাটিযাব বাঁশে। তারপর চালাঘরে ঢুকে বার ক'রে আনলে টাঙিটা।

'জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়।'—বলেই খুদে এক কোপে কেটে ফেললে ঘুণিরামের মাথাটা।

কাটা মাথাটাকে ধ'রে লাফাতে লাগলো খুদে। লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাস্তায় হাজারো মানুষ। বাজছে ঢাক। ড্যাং-ড্যাডা-ড্যাং ড্যাডাং-ড্যাং। ঢ্যাং-ঢ্যাঢা-ঢ্যাং ঢ্যাঢাং-ঢ্যাং শ্মশান-সন্ন্যাসীরা আবার রঙ মেখেছে মুখে, ছাই মেখেছে সারা গায়ে। ধর্মযুদ্ধের সেনা এক একজন। 'জাগরে জাগরে ভাই সত্যের কোটাল। জয় বাবা ঈশানেশ্বরের জয়।'—চিৎকার করতে করতে লাফাচ্ছে ওরা। ওদের গলায় কাগজের মালা দুলছে। নেচে নেচে উঠছে শোলার মুকুট। বেজে উঠছে কোমরের ঘুঙুর। তলোয়ারে টাঙিতে ঠুকে আওয়াজ উঠছে ঠকাং ঠং। পাগলের মত নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ধর্মযুদ্ধের সন্ন্যাসীরা।

ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাড্ডা-ড্যাডাং। ঢ্যাঢাং-ঢ্যাঢাং ঢ্যাঢ্ঢা ঢ্যাঢাং। বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে উঠছে ঢাকের আওয়াজ। লাফাচ্ছে ঢাকীরা। লাফাচ্ছে সন্ন্যাসীরা। লাফাচ্ছে সুজয় সামন্ত।

ঘুণিরামের কাটা মুণ্ডু হাতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে খুদে।

'কার সাথে যুদ্ধ গো ? করে সাথে যুদ্ধ ?'—প্রাণপণে চিৎকার করলে খুদে। ঢাকের আওয়াজ আর হল্লায় ওর কথা শোনা যায় না। মাঝরাস্তায় একা একাই নাচছে ও। ওকে কাছ থেকে দেখে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে লোকে। সামনে ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি হৈ চৈ।

কাটা মুণ্ডু হাতে নাচতে নাচতে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল খুদে। ওকে দেখেই থমকে গেল ভিড়। চমকে উঠলো মানুষজন। থেমে গেল ঢাকের আওয়াজ।

সামনে পঞ্চা। নাচতে নাচতে পঞ্চার কাছে গেল খুদে। চিৎকার ক'রে বললে, 'কার সাথে যুদ্ধ রে ? কার সাথে যুদ্ধ ?' পঞ্চা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

ভিড়ের ভেতর শম্ভু মোড়ল আর অনঙ্গ ঘোষালের দিকে নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল খুদে। জিগ্যেস করলে 'কার সাথে যুদ্ধ গো ঠাকুর ? ধর্মযুদ্ধ কার সাথে ?'

চমকে সরে গেল ওরা।

ক্যামেরায় চোখ রেখে এক মনে ছবি তুলছিল সুজয় সামন্ত। বাপের মুণ্ডু হাতে নাচতে নাচতে ওর কাছে এগিয়ে গিয়েও খুদে একই কথা শুধোলে : 'কার সাথে যুদ্ধ গো বাবু ? কার সাথে যুদ্ধ ?'

ক্যামেরার সাটার টিপতে গিয়ে ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো সুজয়।

চারপাশে সবাই চুপ। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই খুদেকে। খুদে একাই লাফাচ্ছে নাচছে আর চিৎকার করছে। নাচতে নাচতে বাপের কাটা মুণ্ডুটাকে চোখের সামনে তুলে প্রাণপণ চেঁচিয়ে বলছে, 'বল বাপ, কার সাথে যুদ্ধ ? ধর্মযুদ্ধ কার সাথে ? এ্যাঁ কার সাথে ধর্মযুদ্ধ ? বল বাপ বল।'

মূর্তি

মাঝ রাত্তিরে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো গোবিন্দ পাল। মাথা ঘুরে গেছে বোঁ ক'রে। যা দেখলো তা সত্যি তো?—নাকি স্বপ্ন? ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সে মূর্তিটার দিকে। ভূতে ধরা মানুষ যেমন ওঝার চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ায় তেমনি উঠে দাঁড়ালো গোবিন্দ। আবার ব'সে পড়লো মেঝেয়। দু-চোখ এখনো অন্ধকার। দু-হাতে চোখ কচলে মাথা ঝাঁকালো। তারপর চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

উঠোনের ওদিকে মেটে দাওয়ায় ঘুমোচ্ছে ওরা। গোবিন্দর বৌ, ছেলে আর বোন সাবি। গোবিন্দ দাওয়ায় উঠে বৌকে ঠেলতে লাগলো।

'ও মন্টুর মা। শুনছো ওঠো ওঠো।'

'উঁ উঁ? কী হয়েছে?'—ঘুম জড়ানো গলায় সাড়া দিল বৌ।

'ঐ যে ভিখিরির ট্যাচুটা বানিয়েছি না?— ফিনিশ দিলুম এই মাত্তর—চোখ আঁকা হতেই দেখি ট্যাচুটা চোখের পাতা ফেললে!

'এ্যাঁ? নেশাভাঙ করছো নাকি আজকাল?—' মুখ ঝামটা দিলে বৌ।

'না গো সত্যি বলছি, বিশ্বেস কর, পষ্ট দেখলুম ওটা চোখ বুঁজেই আবার চাইলে।'

উম্‌-মর মিনষে! আবার ঐ কথা? মাটির ঢেলা নিয়ে আর রাত দুপুর ওব্দি মস্করা করতে হবে না। শোও গে যাও।'

বৌ হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো। ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে গোবিন্দ চালাঘরে ফিরে এল। বিশ্বাস করলে না বৌ। মস্করা ব'লে উড়িয়ে দিলে। বিশ্বাস না করার-ই কথা। নিজের চোখে না দেখলে গোবিন্দর নিজেরই বিশ্বাস হ'ত না। মাটির মূর্তি জ্যান্ত হয়ে চোখ বোজে কস্মিন কালেও শোনেনি কেউ। এই অসম্ভবও সম্ভব হ'ল গোবিন্দর হাতের গুণে। বাপ বলতো, প্রাণ-পিতিষ্ঠে করতে হয় বাপ, মাটির ঢেলায় প্রাণ-পিতিষ্ঠে যে করতে পরে সে-ই হ'ল আসল শিল্পী। টি বি হয়ে অকালে মরেছিল বাপ। মূর্তিতে প্রাণ পিতিষ্ঠে করে যেতে পারেনি। আজ গোবিন্দ পারলো।

চালাঘরে এসে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো গোবিন্দ। সত্যি নিখুঁত হয়েছে বটে ট্যাচু। একেবারে হুবহু সেই কোর্ট' বটতলার ভিখিরিটা। দশ কাঠা জমিটা গত ফাল্গুনে ভূষণ সামন্তকে বেচতে শহরে গিয়ে রেজিস্টারি আপিসের সামনে দেখেছিল। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির দগদগে ঘা। হাতে পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। কঙ্কালসার চেহারা। জরাজীর্ণ। কাৎরাচ্ছে ভিখিরিটা: দুটো পয়সা দ্যান গো বাবুরা, দুটো খেয়ে বাঁচি। পয়সা দিতে কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখেছিল গোবিন্দ। ভিখিরিটার একটা চোখ কানা, অন্যটাতে জুলজুল ক'রে চায়। ভ্রূ-তে পাক ধরেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুলে নোংরার জট।

দেখেই মনে হয়েছিল এটাকে মাটি দিয়ে বানাতে হবে।

বাড়ি ফিরেই কাজ শুরু করেছিল গোবিন্দ। নাওয়া-খাওয়া ভুলে একটানা খেটে আজ শেষ হ'লো। সার্থক হ'ল জীবন। আর্ট তো শখের কেরামতি নয়। —বাপ বলতো, শিল্পের নেশায় মাতাল হতে হয় রে, পাগল হতে হয়, তবে না জ্যান্ত হয়ে ওঠে মাটির ঢ্যালা।

বাপ মারা যাবার পর গোবিন্দ দেব-দেবী গড়ার ফাঁকে দু চারটে মানুষের মূর্তি যে গড়েনি তা নয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবিঠাকুর—অনেক কিছুই গড়েছে। তারিফ করেছে লোকে। বলেছে হ্যাঁ হাত বটে গোবিন্দ পালের! কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন দিনই মনে হ'ল না যে, ওটা জ্যান্ত মানুষ। বারে বারে হতাশ হয়েছে গোবিন্দ। রঙের খরচার জন্যে আফশোষ করেছে। আর কেবলই ভেবেছে বাপের স্বপ্ন সত্যি হবে কবে!

সেই স্বপ্ন সার্থক হ'ল এত দিনে। আনন্দে ঘুম এ'ল না গোবিন্দর। শরীরটার ক'দিন ধ'রে জুত নেই, তবু শুতে ইচ্ছে হ'ল না। দাওয়ায় ব'সে জোছনা-মাখা পরিস্কার নীল আকাশ দেখতে দেখতে সে রাতটা কাটিয়ে দিলে। সকালে বৌ পুকুর ঘাট থেকে শাক ধুয়ে বাড়ি ঢুকছিল। গোবিন্দ উঠে গিয়ে বললে, 'কাল রেতে তুমি বিশ্বেস গেলে না, কিন্তুন কথাটা সত্যি। আমি নেশাভাঙ করি না তুমি তো জান। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি বিশ্বেস কর আমি পষ্ট দেখিচি ভিখিরির ট্যাচুটা চোখের পাতা ফেললে।'

'আবার ঐ কথা! একটা পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, দিনরাত কেবল কাদার পুতুলে রঙ বোলানো হচ্ছে।'—ফাটা কাঁসার মত ঝনঝনিয়ে উঠলো বৌ।—'ঐ ভিখিরি শুধু চোখের পাতা ফেলা কেন,— যদি হেঁটে চলে বেড়ায়, কথা কয়, তাহলেও কি পেটের ভাত জুটবে?'

যেন থাপ্পড়। থাপ্পড় কষিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেল বৌ। সাবি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলো। গোবিন্দর কাছে এসে বললে, 'কী হয়েছে গো দাদা?'

'আরে ঐ তোর বৌদি, কিছুতেই কোন কথায় আমল দেয় না। ভাবছে মাটির ট্যাচু আবার জ্যান্ত হয় কী ক'রে?'—গোবিন্দ বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা ক'রে শোনায়।—আরে বাবা, আশ্চর্যি আশ্চর্যি ঘটনা তো পিরথিবীতে এখ না ঘটে, না কি?'

'হ্যাঁ ঘটেই তো।'

'ঘটে না? নইলে বিনা মেঘে বাজ পড়ে কী ক'রে? কোথাও কিছু নেই—ভূতে দর্শন দেয়। দিন দুপুরে আঁধার দেখে মানুষ।—তা-ই বা কী ক'রে হয়?'

'হ্যাঁ, আমারও তো হয়।'—সাবি জানায়—'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে আঁধার দেখি, মাথা ঘুরে পড়ে যাই।'

'তবে? সব জিনিষের কি আর ব্যাখ্যা হয়?' বিশ্বেস যেতে হয়। কথায় বলে বিশ্বেস মিলাযে বস্তু তর্কে বহুদূর। আমার মূর্তিটা চোখের পাতা ফেলেছে কাল রাত্তিরে।'

'এ্যাঁ' তাই নাকি? বাবা ধর্মরাজ এবার মুখ তুলে চেয়েছেন গো! সংসারে আর কষ্ট থাকবে না। মাটির ঢেলায় নেমে এযেছেন ঠাকুর!' —জোড়হাত কপালে ঠেকায় সাবি।

গোবিন্দ ফোঁস ক'রে ওঠে: 'আ-ধুর। ধর্মরাজের ট্যাচুটা নয়, ওটা এখনো দু-মেটেই হয়নি। ভিখিরি, ভিখিরি।—ভিখিরির ট্যাচুটার কথা বলছি।'

'অ। তাই বল।—যাই, কাজ সারি গে যাই।' —হাই তুলে চলে গেল সাবি।

গোবিন্দ তাজ্জব। সাবিও পাত্তা দিলে না। যেন মাটির

ভিখিরির চোখ বোজা কোন ব্যাপারই নয়। মাটির দেবতা জাগ্রত হ'লে বিশখানা গাঁয়ের লোক ছুটে আসে, অথচ ভিখিরির বেলায় ভোঁ ভাঁ। ধুত্তেরি!

শরীরটা টিস্ টিস্ করছে। গা বমি বমি ভাব। কী যে হয় আজকাল! গোবিন্দ কাঁধে গামছা ফেলে বাড়ি থেকে বার হ'ল। মজা ডোবার পাড়ে টিউবওয়েলটায় এখনো জল ওঠে। গোটা পাড়ার লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে জল নিতে এই সাত-সকালে। তাদের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে ভরপেট জল খেয়ে নিলে গোবিন্দ। এটা রোজকার অভ্যাস। দাস্ত পরিষ্কার হয়।

মাঠে গিয়েও কিন্তু ভাবনাটা গোবিন্দকে ছাড়লো না। ভগবান মানুষ গ'ড়ে প্রাণপৃতিষ্ঠে করেছিলেন। তাইতেই দুনিয়া। গোবিন্দ গড়ছে আর্ট-এর ভিখিরি, সেটাও যদি ক্রমশঃ মানুষের মতন ····।

ফুটি ফাটা মাঠ। যতদূর চোখ যায় সবুজের চিহ্ন নেই। টানা আটমাস আকাশের জল নেই। তাই চাষ নেই। মানুষের কাজ নেই। গোবিন্দর অবিশ্যি জমিও নেই। সব শেষ। শেষ দশ কাঠা বেচে ধার দেনা মিটিয়েছে। বৌটা বাড়ি বাড়ি মুড়ি ভেজে বেড়াচ্ছে। সাবি গেরস্থ বাড়ির ঝি। কিন্তু কী-ই বা করার আছে গোবিন্দর? শহরের ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে রিক্সা কিনে টানবে? নাকি চৈতন্য ঘরামির মত ঘরের চালে উঠবে?—ও সব করতে গেলে তো নিখুঁত মূর্তি গড়া হয় না, আর্ট হয় না। ও সব কাজ সবাই করতে পারে, কিন্তু শিল্পে প্রাণ-পৃতিষ্ঠে করতে পারে ক-জন?

শরীরটা বড্ড কাহিল লাগছে। আম গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল গোবিন্দ। মনে হ'ল ভিখিরিটা বলছে, 'ভগবান

নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, আর তুই বানালি আমায়।'

'কেন, আমি কি রাজার ব্যাটা?'—গোবিন্দ জবাব দিলে, 'দেখছো না ঘরে ভাত নেই?'

'তাই ব'লে ভিখিরি? সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি একটা ঘাটের মড়া ভিখিরি? কেন, আর কিছুই হতে সাধ যায় না তোর?'

গোবিন্দর খুব ইচ্ছে হ'ল, বলে—আমি শিল্পী,—আর্টিস্ট—আর্ট'ই আমার সাধ,—কিন্তু তার আগেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। জেগে উঠে খুশিতে ভ'রে উঠলো মন। জাগ্রত হয়েছে মূর্তি, স্বপনে ও দেখা দিয়েছে, কথা কয়েছে। এর থেকে বেশি আনন্দের আর কী আছে?

কিন্তু বাড়ি ঢুকতেই খ্যাঁকখ্যাঁক ক'রে উঠলো বৌ: 'বাবু বেড়িয়ে ফিরলেন। শান্তিপুরের নন্দাই অত ক'রে বললে তাঁদের কাজটা শিখে নিতে। মিনষের সেদিকে মতি নেই। দিনরাত মাটির ঢেলায় রঙ বোলাচ্ছে। অকম্মার ঢেঁকি! এস, খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে এস।'

পুকুরে বেশি জল নেই। হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে মাথায় গামছা ভিজানো জল দিয়ে এসে বাধ্য ছেলের মত খেতে বসলো গোবিন্দ। মন্টু আর সাবির খাওয়া হয়ে গেছে। গোবিন্দ আর ওর বৌ বাকি। এ্যালুমিনিয়ামের থালায় একদলা খুদ-সিদ্ধ আর এক বাটি শাক এগিয়ে দিলে বৌ।

'তুমিও আমার সঙ্গে বসো,—বেলা হয়েছে ঢের।'—গোবিন্দ বললে।

'অত সোহাগে কাজ নেই। গিলে উঠে যাও।'

'না না, দেখি তোমার কী আছে।'—বলতে বলতেই হাঁড়ির ঢাকা খুলে ফেললে গোবিন্দ। হাঁড়ির ভেতর ভোঁ ভাঁ, পরিষ্কার—

যেন ধুয়ে রেখেছে বৌ। কড়াতে খানিকটা শাক-সিদ্ধ এখনো পড়ে আছে।

'অ, এই মতলব!'—ব'লে ভাত ভাগ ক'রে বৌ-এর দিকে এগিয়ে দিলে গোবিন্দ।

খেতে খেতে কথা। বৌ বলে, 'আর যে চলে না গো! ভিখিরি ভিখিরি না বানিয়ে দু-চারটে ঠাকুর ফাকুর যদি গড়তে তো বিকোতো।'

'বায়না কোথা?'—গোবিন্দ বোঝায়, 'বর্ষাটা লাগতে দাও না কাজকাম না থাকলে, লোকের হাতে পয়সা না থাকলে মূর্তি কিনে পূজো করবে কে?

বৌ চুপ ক'রে শুনছিল। গোবিন্দ গলা নামিয়ে বললে, 'তাছাড়া মানুষ গড়েছি বলেই-না প্রাণ-পৃতিষ্ঠে হ'ল। কলকেতার বাবুদের কানে একবার পৌঁছোতে দাও-না, তখন দেখবে এই গোবিন্দ পালকে প্রাইজ দেবে খোদ সরকার বাহাদুর।'

'এ্যাঁ?'—বৌ ভ্রূ কুঁচকে তাকালে।

শোননি শিল্পী রমেশ পালের গড়া মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে যাদুঘরে? তাও তো মরা,—সরস্বতী ঠাকুর! আমার মূর্তি যদি কেরমে কেরমে জ্যান্ত হয়ে ওঠে.............

ওঃ ভাবতেই পারছি না।......'

উৎসাহে গলায় শাক আটকে বিষম খায় গোবিন্দ। কাশতে কাশতে লালচে গয়ের তুলে খানিক বুঁদ হয়ে ব'সে থাকে। তারপর সারাটা দুপুর বিকেল ভিখিরি মূর্তিটার সামনে বসে চেয়ে চেয়ে নিরীক্ষণ করে ওর কোন অঙ্গটা ঠিক ঠিক মানুষের মত হতে বাকি।

অনেক রাত্তিরে মূর্তিতে ছোট ছোট আঁচড় দিচ্ছিল

গোবিন্দ আর বারে বারে চেয়ে দেখছিল ওর মুখ। হঠাৎ মনে হ'লো ভিখিরিটা হাসলো।

গোবিন্দ থ। চোখ বড় বড়, চোখের সামনে অন্ধকার। মাটিতে ধপ ক'রে বসে পড়লো আবার। তারপর হাসলো নিজেও। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললো,—হায় বাপ, এমন সৃষ্টি আমি তোমায় দেখাতে পারলুম না।

পরদিন গোবিন্দর গা গরম। মাথার মধ্যে চিনচিনে ভাবটা বেড়েছে। কেবলই ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। কাল রাতের ঘটনাটা কিন্তু কাউকে বললে না। আর্ট বোঝে না যারা তাদের আর ব'লে কী হবে?

রাতে ঘুম আসছিল না। উঠে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছিল। বসে বসেই গোবিন্দ রঙ তুলির ছোট ছোট আঁচড় টানছিল। ভিখিরিটা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দেখতে দেখতে এক সময়ে গোবিন্দর মনে হ'ল ক্রমশঃ মাথা নীচু করছে ওটা। ঝাপসা দেখা যাচ্ছে মাথা নামাতে নামাতে একেবারে গোবিন্দর ঘাড়ে এসে পড়লো যেন মূর্তিটা।

মাথা ঘুরে পড়ে গেল গোবিন্দ। তিনদিন বিছানায় লেপ্টে রইল। ওঠবার শক্তি আর ওর ছিল না, শুয়ে শুয়েই আপন মনে কথা ব'লে চললো ও ভিখিরিটার সঙ্গে।

দলা দলা খুদ সিদ্ধ, গরম ফ্যান গোবিন্দর মুখের কাছে ধরলে বৌ। দু-এক গ্রাস খেয়ে আর খেতে ইচ্ছে হল না। ক্রোশ-দুই দূরে দিঘিতে জল আছে, গুগলী শামুক আছে। তাই তুলে ঝোল রেঁধে দিলে বৌ, গোবিন্দ বমি করে তুলে ফেললে। বমির রঙ লাল। লাল লাল খুদ সিদ্ধ শাকের কুচো উঠে আসছে পেট থেকে। সেই সঙ্গে দাস্ত। লালে লাল

দুর্গন্ধ বিছানা। গোবিন্দ এপাশ ওপাশ করছে। পাড়াপড়শীদের বললে বৌ। পড়শীরা বারে বারে এসে দেখে গেল। কেউ বললে রোদের ঝাঁঝ লেগে এমনি হয়েছে। তাল মিছরী আর পাতিলেবু খাওয়াতে হবে। কেউ বললে ডাব খাওয়াও সাবু খাওয়াও। কেউ বিধান দিলে, হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল হত, নিদেন পক্ষে গঞ্জের হাটে পঞ্চা কম্পাউণ্ডারকে খবর দেওয়া দরকার।

কিন্তু মিছরী থেকে কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত কোনটাই গোবিন্দর বৌ-এর সাধ্যে কুলোয় না। হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে আড়াই ক্রোশ গরুর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাস ধরতে হয়। এই খরার সময় গাঁয়ের বাবুদের কাছে গরুর গাড়ি মিলবে না। বাঁশের ডুলীতে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে পড়শীরা রাজি। কিন্তু ডুলী সাজাবার আগেই বার কতক বমি ক'রে চাপ চাপ রক্ত তুলে গোবিন্দ ম'রে গেল সাত-সকালে।

পাড়ার লোকে গোবিন্দকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর সারা-দিন দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে চুপচাপ কাঁদতে লাগলো মেয়েমানুষটা। মন্টু আর সাবি বারে বারে ওর কাছে এল। পাড়া-পড়শীরা এল। ওকে ওঠাবার চেষ্টা করলে। ও উঠলে না। ওর মুখের কাছে গোটা গোটা দুধ-সাদা গরম ভাতের থালা ধরলে। বৌ ছুঁলে না। একটি কথাও বললে না।

অনেক রাতে চালাঘরের দাওয়ায় উঠলে মেয়েমানুষটা। মূর্তিটা শেষ হয়েছে হপ্তা ঘুরতে চললো। কিন্তু এখনো দেখা হয়নি। ভিখিরির ট্যাচু নাকি চোখ মেলে চেয়েছিল। হেঃ। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি, ভিজে যাচ্ছে তপ্ত চোখের জলে। মাটির ঢেলায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠে করেছে ব'লে লোকটা ওকে বারে বারে দেখবার

জন্যে বলেছিল। কিন্তু বৌ দেখেনি। দেখতে ইচ্ছেই হয়নি। ইচ্ছে হবে কী ক'রে? আকাশে আগুন, মাটিতে আগুন, পেটের মধ্যে আগুন। আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেছে মনটা।

গোবিন্দ নেই। দু চোখ বেয়ে দরদর ক'রে জল গড়াচ্ছে মেয়েমানুষটার। গোবিন্দর কি ভীমরতি হয়েছিল? মিছে কথা বলার লোক তো সে নয়। তাহলে এমন আজগুবি বৃত্তান্ত ও ব'লে বেড়াচ্ছিল কেন? ভীমরতি, নাকি মাথার গোলমাল? যাই হোক, এত পরিশ্রম ক'রে মানুষটা ট্যাচু বানিয়েছিল, সেটা একবার দেখা উচিত ছিল ওর।

চালাঘরের ঘুপচি অন্ধকারে লম্ফ জ্বেলে ঢুকলো বৌ। বাঁশ, কাঠ, খড়-মাটি-চট-ন্যাকড়ায় ঘরের অর্ধেক বোঝাই। রঙের কৌটো, চুনের ভাঁড়, শন পাটে মেঝে ভর্তি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। লোকটার কঙ্কাল সার চেহারা, হাতে-পায়ে কুষ্ঠ, ঘায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। লোকটার মাথায় নোংরা চুলের জট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভ্রূতে পাক ধরেছে, একটা চোখ কানা, অন্যটাতে জুলজুল ক'রে তাকিয়ে আছে। নিখুঁত একেবারে নিখুঁত।

বড় বড় দুচোখ তুলে এক দৃষ্টে দেখছিল মেয়েমানুষটা। তাজ্জব হয়ে গেছে ও। লম্ফের কাঁপা কাঁপা আলোয় ওর মনে হচ্ছে একটা জ্যান্ত মানুষের সামনে ও দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার হাতে কী? গোবিন্দ যে বলেছিল ওটা ভিখিরি! কিন্তু হাতে ওর রঙের কৌটো কেন? ডান হাতে তুলি কেন?

মাথার মধ্যে দপদপ করছে। আলো আঁধারিতে চকচক করছে মূর্তিটার শরীর, মুখ, মুখের কাঁচা-পাকা দাড়ি। ঘামছে কি মানুষটা? গলা আর চোয়ালের শিরাগুলো অত ফুলে ফুলে

উঠছে কেন? পাকা ভ্রূর নীচে কোটর থেকে চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কেন? এই আকালে বুঝি বড় কষ্ট ঐ হাভাতে মানুষটার!

দেখতে দেখতেই ধপ ক'রে মাটিতে পড়লো বৌ। একেবারে কাটা কলাগাছের মত।

ওর স্পষ্ট মনে হ'ল ওটা গোবিন্দ!

অথ মর্কট বৃত্তান্ত

রবিবারের দুপুরে গুরুভোজনের পর যথারীতি বিছানায় গড়িয়ে টি. ভি. তে ফিল্ম দেখছিলেন ভুজঙ্গবাবু—এটা বরাবরের অভ্যাস. এতে বিশ্রামও হয় জ্ঞানও বাড়ে—কিন্তু স্ক্রীনে হঠাৎ জলতরঙ্গ খেলতে শুরু করলো। কী ব্যাপার? ভুজঙ্গবাবু নব ঘোরালেন সুইচ অফ অন করলেন, কিন্তু ভল্যুম, পিকচার চ্যানেল্স সব ঘুরিয়ে ফিরিয়েও সেই এক জল তরঙ্গ ক্রমাগত খেলে যাচ্ছে টি ভি-তে,—কোথাও কোন ছবি নেই, হঠাৎ মরুভূমির মরীচিকা হয়ে গেল গোটা স্ক্রীণ।

'যাঃ!'—ব'লে ষ্টিম এঞ্জিনের মত একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারে প্রায় ফেটে পড়লেন স্ত্রীঃ 'নির্ঘাৎ আবার লটকে দিয়েছে দেখো, মুখপোড়াদের জ্বালায় নাচের সীনটাই মাঠে মারা গেল।'

আধপোড়া সিগারেটটা এ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিয়ে নিমপাতা চিবোনোর মত মুখে উঠলেন ভুজঙ্গ। কোন কথা না ব'লে তর তর করে ছাদের সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। একটু বেশি ঝড়-টড় হলেই এ্যান্টেনা লটকে গিয়ে ছবির বদলে মরীচিকা তো হামেশাই হয়।

কিন্তু ছাদে উঠেই থমকে দাঁড়াতে হল। ভুজঙ্গর চোখ ছানা-বড়া। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন এ্যান্টেনার মাথায়। সেখানে পায়ের ওপর পা তুলে দোল খাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড হনুমান। দোল খেতে খেতেই উকুন বাচছে, লেজ ঝাপটাচ্ছে, তাকাচ্ছে এদিক ওদিক আর সমানে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে এ্যান্টেনা। কলকাতার দিকে মুখ করা এ্যালুমিনিয়াম স্টিক ঘুরতে ঘুরতে দিল্লী, মাদ্রাজ বোম্বে হয়ে কন্যাকুমারিকা।

ভুজঙ্গ থতমত। স্ত্রীর 'মুখ-পোড়া' কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন, কিন্তু কী করনীয় ভেবে পেলেন না। হনুমান ইতর প্রাণী, বুদ্ধিশুদ্ধি যেমনই হোক দুর্বুদ্ধি যে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। গৃহস্থর বাগানে আম-জাম-কলা খেয়ে নষ্ট করে, টালির চালে লাফালাফি করে টালি ভাঙে, ছাদে কুলের আচার শুকোতে দিলে কুলো-শুদ্ধু তুলে নিয়ে সোজা তেঁতুল গাছে উঠে পড়ে—এ সব তো বরাবরের বাঁদরামি, কিন্তু টি. ভি. এ্যান্টেনায় দোল খাওয়া—এ কেমন অত্যাধুনিক উপদ্রপ ?

চিলে-কোঠার পাশ থেকে হনুমানটাকে দেখে নীচে নেমে এলেন ভুজঙ্গ। স্ত্রী বললেন, 'কী হল ? এ্যান্টেনা ঠিক আছে ?'

'হুঁ এ্যান্টেনা !'—ফোঁস করে ভুজঙ্গ বললেন, 'দোল খাচ্ছে একটা ধেড়ে হনুমান।'

'হনুমানটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলে না ?'

'হেঃ, তাড়াতে গিয়ে থাপ্পড় খাই আর-কি !'

আসলে এ্যান্টেনা থেকে হনুমান তাড়াতে গিয়ে এ পাড়ায় থাপ্পড় খেয়েছে অনেকেই। বাগচীবাবু, সুধাময়বাবু, খোকন সরকার। ভুজঙ্গর মনে পড়লো থাপ্পড় খাওয়ার ব্যাপারটা প্রথমে বলতে চায়নি ওরা কেউ। বাগচীবাবুর গালে আঙুল বসে যাওয়ার

দাগ দেখে ভুজঙ্গই জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী হ'ল গালে ?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না ঠিক।'—দায়সারা জবাব দিয়েছিলেন বাগচীবাবু, 'মাদুর'র শুয়েছিলাম তো, তাই বোধ হয়...।'

দাগটা কিন্তু মাদুর-কাঠির থেকেও মোটা এবং মাত্র পাঁচটা, তাছাড়া কালশিটার কালো, তাই লোক-জানাজানি হতে দেরী হয়নি। কানাকানিও শুরু হয়ে গিয়েছিল ঃ মাদুর নয়, বাঁদর, নির্ঘাৎ পাঁচ আঙুল কষে চড় কষিয়েছে বাঁদরে, নইলে কালশিটে পড়ে ?

—এসব অবশ্য যাদের টি. ভি. সেট নেই তাদের পরচর্চা—জেলাসি ! আসলে দিনকাল এমন যে, স্ট্যাটাস দেখলেই লোকের চোখ ওঠে। টি. ভি. প্রোগ্রাম দেখতে লোকের বাড়িতে ছুটবে আবার নিন্দেও করবে। তাই তো হনুমানের থাপ্পড় খাওয়ার পর বাগচীবাবু আর সুধাময়বাবু এ্যান্টেনা ঠিক করেননি এক হপ্তা।

কিন্তু লোকের ওপর রাগ ক'রে কিংবা থাপ্পড় খাওয়ার ভয়ে ট্যারা-বাঁকা এ্যান্টেনায় হনুমানের দোল খাওয়া দেখে কাটানোরও কোন মানে হয় না। পাড়ার লোকেই বলবে, হনুমানের ভয়ে ভুজঙ্গদার লেজ গুটিয়ে গেল।

সুতরাং একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু হঠকারিতা নয়। বাগচীবাবুর মত লাঠি নিয়ে হনুমান তাড়াতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ভুজঙ্গ ছাদে উঠতে লাগলেন হাতে এক ছড়া কলা নিয়ে। চিলে-কোঠার দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কলার ছড়াটা হনুমানের চোখের সামনে দোলাতে লাগলেন। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট ঃ এস বাবা, নেমে এস, দয়া করে কলা নিয়ে এ্যান্টেনা ছেড়ে বিদায় হও।

হনুমানটা এ্যান্টেনায় বসে দোল খেতে খেতে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে, কিন্তু নামছে না। নেমে এগিয়ে এলেই ওর দিকে কলার

ছড়াটা ছুঁড়ে দিয়ে ভুজঙ্গ ছাদের দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন এরকমই মতলব। হাতে হাতে কলা উপহার দেওয়াটা বড় বেশি রিস্কি হয়ে যায়।

কিন্তু অনেকক্ষণ কলা দেখিয়েও হনুমানকে কিছুতেই নামানো গেল না। ভুজঙ্গ তখন ছড়াটা থেকে একটা কলা ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলেন ছাদে—খানিক তফাতে। হনুমানটা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলো না। ভুজঙ্গ আর একটি কলা ছুঁড়লেন। তাতেও কাজ হ'ল না। তখন পুরো ছড়াটাই দিলেন ছুঁড়ে। হনুমানটা বোধ হয় সন্তুষ্ট হ'ল। হুপহাপ শব্দে সমুদ্র পেরোনোর কায়দায় নেমে এসে ঝটপট কলাগুলো নিল, কিন্তু তা হতোস্মি এ্যান্টেনাতেই উঠে গেল আবার। উঠে কলা খেতে খেতেই দোল খেতে লাগলো। শুধু তাই নয় এক একটা কলা মুখে পোরার আগে ছাড়াচ্ছে আর খোসাটা ছুঁড়ে দিচ্ছে সোজা ভুজঙ্গর মুখে।

ইতিমধ্যে বড় ছেলে অনঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। সে কলেজে পড়ে, অনেক খবর রাখে। বললো, 'কলা-কলা দিয়ে কিস্যু লাভ হবে না বাবা। চারদিকে যা শুনছি, টি. ভি. বন্ধ না করা অব্দি হনুমান এ্যান্টেনা থেকে নড়ছে না।'

'তার মানে?'

'মানে যতক্ষণ টি. ভি.-র সুইচ অন্ করা থাকবে ততক্ষণ মর্কটগুলো সমানে এ্যান্টেনায় বসে দোল খাবে। এখন বন্ধ থাক, সন্ধ্যেবেলায় দিবাকর-কাকা এলে বরং এ্যান্টেনা ঠিক করে আবার চালানো হবে।'

কথাটা মনে ধরল ভুজঙ্গর। দিবাকর এক্সপার্ট লোক। অনেকদিন থেকে টি. ভি. নেবে ভাবছে, তাই এখন পাঁচবাড়ি দেখে বেড়ায় কোন্ সেটে কেমন ছবি আসে। এ্যান্টেনা বেঁকে গেলে

বেশ কায়দা ক'রে লাগাতেও পারে।

সন্ধ্যেয় সিনেমা শুরুর খানিক আগে দিবাকর এল। এ্যান্টেনা লটকানোর খবর বিকেলেই পেয়েছিল। এসে বললো. 'অন্ধকারে চুপিচুপি লাগাতে হবে। দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই, আবার হুপহাপ ক'রে এসে হাজির হবে। সর্বত্র এই হচ্ছে, যে এ্যানটেনায় একবার চড়াও হয় কন্‌ষ্ট্যাণ্ট ওয়াচ রাখে তার ওপর।'

সুতরাং মই দড়ি বাঁশ নিয়ে অন্ধকারেই উঠতে হ'ল ছাদে। অনঙ্গ মইয়ে উঠেছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছু। ভুজঙ্গ তাই টর্চ জ্বাললেন। হাঁ হাঁ করে উঠলো দিবাকর, কিন্তু টর্চ না জ্বেলে উপায় নেই, কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।

ঝটপট বাঁকাচোরা স্টিক ঠিক ক'রে নীচের ঘরে এসে পটাপট জানালাগুলো বন্ধ ক'রে দিলে অনঙ্গ। হনুমান যদি দেখতে পেয়ে যায় যে টি. ভি. চলছে তাহলে আর রক্ষে নেই।

সুইচ অন্ ক'রে সেট-এর সামনে বসে পড়লো গোটা পরিবার। ভুজঙ্গর স্ত্রী মুখে হুখিলি পান পুরে দিয়ে মেয়েকে ফিসফিস ক'রে জিগ্যেস করলেন, 'এ বইটায় কে কে আছে র‍্যা বুড়ি?'

বুড়ি বললো, 'দাদা তো বলছিল গুরুর বই।'

ছবির আগে বিজ্ঞাপন। হাঁ করে দেখছে সবাই। সাতষট্টিটা বিজ্ঞাপন একেবারে চমৎকার। কিন্তু তার পরই কাঁপতে লাগলো ছবি, কাঁপছে যেন জলতরঙ্গ, তির তির তির তির......ছবি আসছে আর গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে ঢুকে যাচ্ছে তলায়. ঝিরঝির ঝিরঝির .....ব্যাস, ছবি মুছে গিয়ে যথারীতি মরীচিকা।

'ঢোট্‌!'—ব'লে উঠে প'ড়ে পানের পিক ফেলতে বাইরে চলে গেলেন ভুজঙ্গর স্ত্রী। 'ধেত্তেরি'—বলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন ভুজঙ্গ। দিবাকর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'অনঙ্গ তুমি ছাদে চল'

আমি একটু বাড়ির বাইরে থেকে হনুমানগুলাকে ওয়াচ ক'রে আমি ওদের মতিগতিটা আগে বোঝা দরকার। এ্যানটেনা লাগাবার সময় টর্চ জ্বালাটাই আসলে ভুল হয়েছিল।'

অনঙ্গ ছাদের দরজা ফাঁক ক'রে দেখলো একটি নয়, একজোড়া হনুমান। এ্যানটেনা ষ্টিক-এর দু' মাথায় ব'সে দোল খাচ্ছে। যেন পার্কে বসানো দোল খাওয়ার ঢেঁকি। একবার স্টিকের এ মাথাটা নেমে ঠেকে যাচ্ছে ছাদের কার্নিশে একবার ও মাথাটা। স্টিক দুমড়ে মুচড়ে একাকার, দোকানে পাঠানো ছাড়া আর উপায় নেই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো অনঙ্গ। যে বাড়িতে হোক ছবিটা দেখে নিতে হবে। গুরুর বই, মিস্ করা যায় না। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়! সামনেই মদন দত্তর বাড়ি। রঙিন সেট। দরজা ভেজানো ছিল। গুটিগুটি ঢুকে পড়লো অনঙ্গ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ভিড়ের মধ্যে একজনের প্রায় কোলেই বসে পড়লো।

'অনঙ্গ এলে?'—ফিসফিস করলো লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'আমি এলাম এরা কিভাবে হনুমান তাড়িয়েছে জানতে।'—চাপা গলায় দিবাকর বললো—'শুনলে অবাক হয়ে যাবে, পরে বলছি।'

সিনেমা অর্ধেক হওয়ার পর খবরের সময় মদন দত্ত নিজেই ব্যাপারটা জানালো।

'হনুমান পুজো ক'রে রেহাই পেয়েছি, বুঝলে ভাইপো', —মদন দত্ত অনঙ্গকে বললো—'প্রত্যেক রবিবার রামায়ণ দেখানোর আগে ধুপ-ধুনো জ্বেলে ফুল চন্দন সাজিয়ে টি. ভি.-তে আমরা হনুমান পুজো করি। রূপে হনুমান হলে কি হবে, গুণে তো তিনি দেবতা। অবিশ্যি এ্যানটেনাকে ঘিরে প্রোটেকশন বক্সও একটা

লাগিয়েছি।'

'প্রোটেকশন বক্স?'—অনঙ্গ অবাক।

'হ্যাঁ মানে',—ব্যাখ্যা করলো মদন দত্ত—'এ্যানটেনার রড তো ছাদের কার্ণিশ থেকে উঠেছে। ঐ রডটাকে ঘিরে পেরেক পোঁতা কাঠের লম্বা বাক্স বানিয়ে নিয়েছি যাতে ওঁরা উঠতে না পারেন। আসলে দেবতা হলেও পশু-প্রবৃত্তিটা আর যাবে কোথায়? পূজোয় সন্তুষ্ট না হয়ে যদি চড়াও হয় তাই প্রোটেকশন বক্স।'

শুনে খুশি হ'ল অনঙ্গ। বাবাকে ব'লে ওদের ছাদেও এরকম একটি বক্স লাগিয়ে হনুমান-পূজোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু কপাল মন্দ। খবরের পর সিনেমা শুরু হতে না হতেই টি. ভি. পর্দায় গোঁত্তা খেতে লাগলো ছবি, গোঁত্তা খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে নীচে। এরকম বারকতক হাবুডুবু খেয়েই ছবি বিলকুল উবাও।

রেগে তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে উঠলো মদন দত্ত। ছাদটা একবার দেখে এসেই 'বাঁদরামি বন্ধ ক'রে দেব জন্মের মতন' ব'লে বন্দুক বার করতে যাচ্ছে, বাড়ির লোক জাপ্টে ধরলো। হনুমান হ'ল দেবতা, দেবতাকে কি কেউ গুলি করে মারে? তাছাড়া লাঠি দেখালে যারা চড় কষায়, বন্দুক দেখালে তারা যে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে দেবে তাতে আর সন্দেহ কী?

ক্ষোভে দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো মদন দত্ত। টি. ভি. দেখতে না পেলে ওর দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অফিসে গিয়ে মিনিটে মিনিটে হাই ওঠে, কিন্তু কিছুই করার নেই। এত কাণ্ড করেও তো উপদ্রব আটকানো গেল না!

ফোঁস ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে লোকে ওর ঘর

ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এতদিন পাড়ার মধ্যে শুধু মদন দত্তর অ্যানটেনাই হনুমান-মুক্ত ছিল. এখন তাও গেল মূর্খ মর্কটদের দখলে !

কাগজে চিঠি লেখালেখি চলতে লাগলো। হনুমানের উপদ্রব নিয়ে জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় বেরোতে লাগলো দিনের পর দিন। কোন কোন কাগজ আশঙ্কা প্রকাশ করলো যে, এ হ'ল বিরোধী পক্ষের কাজ, টি. ভি. এ্যান্টেনায় সুকৌশলে হনুমান লেলিয়ে দিয়ে সরকারকে হেনস্থা করতে চাইছে। কে না জানে যে, দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রীর যে কর্মসূচী তার অন্যতম হ'ল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তথা তার জনপ্রিয় সংস্করণ এই টি. ভি. ?

লোকসভাতেও উঠলো বিষয়টা। সাড়ে সাত ঘণ্টা আলোচনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাটাই প্রধান। তিনি বললেন—টি. ভি. হল জ্ঞানের জানালা। দেশবাসীর জন্যে জ্ঞানের এই সুপ্রশস্ত জানালাটিকে উন্মুক্ত রাখতেই সরকার টি. ভি. নেট-ওয়ার্ক ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও। এই অবস্থায় হনুমান যদি এ্যানটেনায় দোল খেয়ে টি. ভি. দেখা বন্ধ ক'রে দেয় তাহলে তো তা সরকারী কর্মসূচী বানচাল করারই অপচেষ্টা,—রীতিমত সাবোতাজ। সুতরাং দেশের আপামর জনসাধারণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কর্মযজ্ঞটির নাম দেওয়া হ'ল : হনুমান হঠাও, দেশ বাঁচাও।

কিন্তু হনুমান দেবতা, তাঁকে হঠানো হবে কোন্ যুক্তিতে ? দেশ কি দেবতাহীন নরক হয়ে যাবে ? ক্ষেপে উঠলো হিন্দু পুরোহিতরা। তখন আবার লোকসভার অধিবেশন ডেকে প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন যে, হনুমান হঠাও মানে হনুমানকে

হঠাও নয়, হনুমানের উপদ্রব হঠাও,—অর্থাৎ হনুমানের উপদ্রব থেকে এ্যানটেনাকে রক্ষা কর, তাহলেই দেশবাসীর জ্ঞানচর্চা রক্ষা পাবে। নতুন শ্লোগানটির নাম হ'ল—এ্যানটেনা বাঁচাও, দেশ জাগাও।

বাস্তবিকই, টি. ভি. দেখার অভাবে গোটা দেশ যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে দেশবাসী যখন তৈরী তখনই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল কিনা প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

ভূজঙ্গবাবু তো হাড়ে হাড়ে ফীল করছেন ব্যাপারটা কত ভয়াবহ। জাতীয় বিপর্যয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। টি. ভি. আসার পর লাইফ কত ফাস্ট হয়ে গিয়েছিল! ঘরে ব'সে স্রেফ টি. ভি. সুইচ অন্ করেই মানুষ জ্ঞানসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল কেমন অনায়াসে। লাইব্রেরী গিয়ে বই এনে পড়ার কোন দরকার ছিল না, বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানের নির্যাস এ্যানটেনা মারফৎ স্ক্রীণে ফুটে উঠে সোজা চালান হয়ে যাচ্ছিল মস্তিষ্কে, বাইরে বেরোনোর ঝামেলা ছিল না, সময় নষ্ট করার দরকার ছিল না। মাঠে গিয়ে খেলাধূলো করার কিংবা খেলা দেখার পর্যন্ত দরকার হ'ত না, ঘরে ব'সে সুইচ টিপলেই বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার থাকতো চোখের সামনে—শুধু সুইচ অন করার অপেক্ষায়।

সেই টি. ভি. কিনা মূর্খ মর্কটের উৎপাতে বন্ধ। টি. ভি. কেনার পর থেকে ভূজঙ্গর রেডিও অকেজো হয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজও বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, বাড়িতে পড়ার সময় কোথা? কিন্তু লেটেষ্ট নিউজটা জানা দরকার। অনেক খুঁজে গুল-ঘুঁটের আড়ালে একটা কুলুঙ্গী থেকে ট্রানজিস্টার সেটটা বেরলো। ইতিমধ্যে কলকাতার একমাত্র বিবিধ ভারতী ছাড়া যে

আর সব কেন্দ্রই খারাপ হয়ে গেছে সেটা জানা ছিল না ভূজঙ্গর! ব্যাটাবি ভবে নব ঘোবাতে ঘোরাতে গলদঘর্ম হয়ে গোটা দুনিয়া চষে ফেললেন, কিন্তু আকাশবাণী কলকাতা শুনতে পেলেন না কোথাও।

দিবাকব অবিশ্যি অনেক খবর দিল। লোকসভার অধিবেশনে নাকি টপ প্রাযবিটি পেয়েছে এই হনুমান! ডিফেন্স এগেন্স্ট্ দ্য মাংকি নামে একটি বিল নাকি ভোটাধিক্যে পাশ করানো হয়েছে। হনুমান ট্যাক্‌ল্ করার জন্যে স্পেশ্যাল একজন হনুমান-মন্ত্রীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে তিনি আপাততঃ এ পদের দায়িত্ব নিজের হাতেই রাখছেন।

অনঙ্গ একখানা খববেব কাগজ এনেছিল। ভূজঙ্গ দেখলেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল যে দেশে সে দেশের মানুষের জ্ঞানচর্চার বিঘ্ন ঘটানো সরকার কোন মতেই বরদাস্ত করবেন না।

যথার্থ কথা। শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ মানুষ নিরক্ষর হলে কী হবে, ভারতবর্ষের মানুষেব জ্ঞানস্পৃহার তো কোন তুলনা নেই। এই জ্ঞানস্পৃহাব জন্যেই না পাবলিকে রাত জেগে টি. ভি.-তে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখে, মিডনাইট প্রোগ্রামে বিদেশী ছবি দেখে, স্নান খাওয়া ভুলে অফিস-কাছারি ভুলে ঘন্টার পর ঘণ্টা ব'সে ক্রিকেট খেলা দেখে টি. ভি.-তে। কোনদিন বাথরুম যাওয়ার সময় না পেলেও পাবলিকে কোন টি. ভি. প্রোগ্রাম মিস করে না। বাস্তবিকই জ্ঞানের নির্যাস চোখের সামনে তুলে ধরতে তো এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটির কোন বিকল্প নেই। সেই যন্ত্রের মাথায় কিনা হনুমানের দাপাদাপি! শিক্ষামন্ত্রী যথার্থ ই সন্দেহ করেছেন,

এ্যাণ্টেনায় চড়ে মূর্খ হনুমান আসলে তাবৎ জ্ঞানের মাথাতেই লাথি মারে,—এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য অবিলম্বে খুঁজে বার করা দরকার।

কিন্তু কী উদ্দেশ্য হতে পারে? অন্য কোন দেশেই তো হনুমানের এমন উপদ্রব নেই। তাহলে এদেশে কেন? সমাজ বিজ্ঞানী তথা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিলেন। একজন প্রস্তাব দিলেন যে, মডেল স্কুল মারফৎ শিক্ষিত ক'রে তুলে ওদের বাঁদরামি দূর করতে হবে। আর একজন বললেন যে, হনুমান তথা বাঁদর হ'ল বুদ্ধিমান মানুষেব পূর্বপুরুষ। সুতরাং হনুমান আসছে নিছক অপত্য-স্নেহের বশে। হনুমান বিদায় করতে তাই যাগযজ্ঞ করে গয়ায় পিণ্ডদান করা দরকার।

প'ড়ে রীতিমত চটে উঠলেন ভূজঙ্গ। হনুমানের অপত্য-স্নেহের কথা তুলে ভদ্রসমাজকে রীতিমত অপমান করা হয়েছে। অপত্য-স্নেহ যদি অত প্রবলই হবে তাহলে তো হনুমান এসে সোজা সমাজ-বিজ্ঞানীর দাড়িতে চুমো খেয়েও গাছে উঠে যেতে পারে, এ্যাণ্টেনায় দোল খাওয়া কেন?

বাজারে টি. ভি. সেট বিক্রি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন রোজ সন্ধ্যেবেলায় ভদ্রলোকেরা চায়ের কাপ আর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বসতেন টি. ভি. স্ক্রীণের সামনে। এখন বিরস মুখে ছেলেমেয়েকে পড়াতে বসেন। কোন রবিবার সকাল-সন্ধ্যায় কাউকে বাজারে দেখা যেত না, এখন বাবুরা রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়ান। ক্রিকেট-মরশুমে কিছু করার না পেয়ে লোকে আবার অফিস-কাছারি স্কুল-কলেজ যাওয়া শুরু করলো।

কিন্তু এভাবে কতদিন? হাঘরে-হাভাতে ছোটলোকদের মত বর্বর যুগের অন্ধকারেই কি মানুষকে বাস করতে হবে চিরদিন?

—না। সব দুর্ভাবনার অবসান—মুশকিল আসান শিপগিরই

আসছে বাজারে। কাগজে প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন দিয়েছে ইতালির একটা সংস্থা। সুপার কমপিউটারের থেকেও অভিনব এই বস্তুটি হ'ল এ্যান্টেনা প্রোটেকশন নেটওয়ার্ক। দামে সস্তা, কাজে চমকপ্রদ।

দিবাকর খবর দিল যে, যন্ত্রটি আসলে একটি জাল। এ্যান্টেনা ঘিরে জালটি ছাদে লাগানো থাকবে যার ভেতর দিয়ে হনুমান গলতে পারবে না কিন্তু ফিলটার চুইয়ে জল নামার মত ছবি আসবে নিখুঁত, মানুষের জ্ঞানচর্চা হবে নির্বিঘ্ন।

দলে দলে লাইন দিয়ে লোকে টাকা এ্যাডভান্স করতে লাগলো এ্যান্টেনা প্রোটেকশন নেট বুক করতে। অনঙ্গ বাবার কাছে টাকা চাইলো। ভুজঙ্গ দিলেন না। হনুমানের অপত্য-স্নেহের কথা তুলে ভদ্রসমাজকে হেনস্থা করা হয়েছে, যতদিন না তার প্রতিবিধান হয় ততদিন টি. ভি. দেখবেন না। দিবাকর আর অনঙ্গ অনেক বোঝালো, ভুজঙ্গ কিন্তু নাছোড়। বললেন, নেট কিনে যারা হনুমান আটকাতে চাইছে তারাও হনুমান।

মাসখানেকের মধ্যেই বাজারে এসে গেল নেট। বাড়ির ছাদে ছাদে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর চলতে লাগলো টি. ভি. যথারীতি। শুধু ভুজঙ্গর ঘরেই টি. ভি. বন্ধ। এ্যান্টেনা সারিয়ে এনেও আর লাগাননি পাছে হনুমান এসে চ'ড়ে বসে। এখন সময় পেলেই ছাদে উঠে পায়চারি করতে করতে আশপাশের বাড়ির ছাদে সার্কাস দেখেন। যেন ট্রাপিজের খেলা। ঘরে টি. ভি. চললেই বাড়ির ছাদে হুপহাপ নামছে হনুমানের দল। জালে পড়েই লাফিয়ে ওঠে তালগাছ সমান, আবার লাফায়, আবার জালে পড়ে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই পাড়ার যত নেট, সব ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। পুরো নেটওয়ার্কই ফুটোয় ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ছাদে

দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে আপন মনেই হাসলেন ভুজঙ্গ। নিজের নিজের বাড়ির ছাদে সিঁড়ির দরজায় গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বাগচীবাবু, সুধাময়বাবু, খোকন সরকার।

শুধু মদন দত্তর এ্যান্টেনাই এখনো আস্ত আছে। পাড়ার সব নেট ফুটো ক'রে দিয়ে হনুমানের দল সেতুবন্ধের কায়দায় গিয়ে লাইন দিয়েছে মদন দত্তর ছাদে। নেহাৎ ওর এ্যানটেনা প্রোটেকশন বক্স-এর ওপরে আবার নেটটা রয়েছে,—ডবল প্রোটেকশন, তার ওপর টি. ভি.-তে হনুমান পুজো,—তাই, কিন্তু ছাদ-ভর্তি হনুমানের যা দাপাদাপি তাতে কতক্ষণ এ্যানটেনা আস্ত থাকে দেখা যাক্। —ভুজঙ্গ মনে মনে বললেন,—হনুমানের আসল অভিপ্রায় না জেনে এভাবে নেট লাগানোর কোন মানে হয়?

ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে মেজাজে সিগারেট টানতে টানতে দেখছিলেন ভুজঙ্গ, পাশে ঘুরঘুর করছিল দিবাকর। সব টি. ভি. বন্ধ হয়ে এখন মদন দত্তর টি. ভি.ঘরে যা ভিড় তাতে কারোর কোলেও আজকাল আর জায়গা হয় না।

'আচ্ছা ভুজঙ্গদা'—দিবাকর বললো, সব হনুমান তো এখন মদন দত্তর ছাদে, এই ফাঁকে চুপিচুপি আপনি টি. ভি. খুলতে পারেন।'

'দিবাকরের কথায় চটে উঠলেন ভুজঙ্গ। পরের বাড়ি টি. ভি. দেখে বেড়ানোই যার স্বভাব সে তো এমন কথা বলবেই। গম্ভীরভাবে বললেন,—'এ্যান্টেনা খুলে রেখে দিয়েছি, দেখছো না?'

'লাগাতে কতক্ষণ! নিয়ে আসবো?'

এক ধমকে দিবাকরের উৎসাহ নিভিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন ভুজঙ্গ, কিন্তু বাড়ির সবাই নেচে উঠলো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকদিন টি. ভি. দেখিনি, বদহজম হচ্ছে, ঘুম হয় না, পায়খানা পরিষ্কার

হয় না'—এমনি হৈ হৈ ক'রে উঠলো সবাই।

সুতরাং মৌন থেকে সম্মতি দিলেন ভুজঙ্গ। আসলে তাঁর রাগ তো আর টি. ভি.-র ওপরে নয়, রাগ সেইসব মর্কটদের ওপর যারা হনুমানের মোটিভ খোঁজার চেষ্টা না ক'রে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে।

সুতরাং এ্যাণ্টেনা ফিট করতে উঠে-প'ড়ে লাগলো সবাই। রোববারে আজ ঠাসা প্রোগ্রাম, রান্না-খাওয়ার সময় পাওয়া অব্দি মুশকিল। অনঙ্গ ধরেছে মই, দিবাকর এক পা কার্ণিশে আর এক পা মইয়ে রেখে বাঁশের সঙ্গে এ্যাণ্টেনার রড বাঁধছে। ভুজঙ্গর স্ত্রী দড়ি এগিয়ে দিচ্ছেন, মেয়ে বাঁশ টেনে ধরেছে। এ্যাণ্টেনা লাগানো হচ্ছে বটে, কিন্তু সবাই ভয়ে ভয়ে মদন দত্তর ছাদের দিকে তাকাচ্ছে। হে ভগবান, হনুমানের যেন চোখ না পড়ে এদিকে! মদন দত্তর ছাদে যতক্ষণ ট্রাপিজের খেলা চলে ততই মঙ্গল। হনুমানের দৃষ্টি এড়িয়ে যত অল্পক্ষণই টি. ভি. দেখা যাবে, তাতে আর কিছু না হোক, দাস্ত পরিষ্কার হবে।

এ্যাণ্টেনা লাগানোর পর সবাই দল বেঁধে নামতে লাগলো নীচে। লক্ষ্য সোজা টি. ভি. ঘর।

কিন্তু নামতে নামতেই ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো সবাই। টি. ভি. প্রোগ্রামের আওয়াজ আসছে যেন! —সেট্ খুললো কে? —বাড়ির সবাই তো ছাদে। সুইচ কি অন করাই ছিল?

তাড়াতাড়ি নীচে নামছে পুরো পরিবারটি। টি. ভি. ঘরের দিকে যত এগোয় গানের আওয়াজ তত জোরে শোনা যায়। কোন সন্দেহ নেই প্রোগ্রাম চলছে।

প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঘরে ঢুকলো অনঙ্গ, সঙ্গে দিবাকর, পেছনে

ভুজঙ্গর মেয়ে, স্ত্রী, সবশেষে ভুজঙ্গ নিজে।

কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্র 'বাপ-রে' বলে এক চিৎকার। অনঙ্গ মুখ থুবড়ে পড়েছে মেঝেয়, পাশাপাশি দিবাকর। তারপরেই বুড়ির চিৎকার : 'ওগো মা গো!'

ঘর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসছিল বুড়ি। মায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুজনেই চৌকাঠে কুপোকাৎ। শুয়ে শুয়েই গোঁ গোঁ আওয়াজ দিচ্ছেন স্ত্রী।

এই অবস্থায় এগোবেন কি পিছিয়ে পালাবেন দু সেকেণ্ড ভাবলেন ভুজঙ্গ। তারপর একরকম মরীয়া হয়েই পা ফেললেন সামনে। হাজার হোক, হেড অব দ্য ফ্যামিলি, তাঁর একটা কর্তব্য তো আছে।

কিন্তু ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়েই ভুজঙ্গর চোখ কপালে। বনবন ঘুরছে চারপাশের সব, চোখের সামনে শুধু ধূধূ সর্ষে ক্ষেত। জ্ঞান হারাতে হারাতেও কোনরকমে নিজেকে সামলে চোখ কচলালেন ভুজঙ্গ। যা দেখছেন তা সত্যি তো? —নাকি স্বপ্ন?

বার বার চোখ কচলে, নিজের হাতে চিমটি কেটেও ভুজঙ্গ দেখলেন সেই অভাবিত ছবি। না, টি. ভি. স্ক্রীণের ছবি নয়, তার থেকে অনেক বেশি লোমহর্ষক, অনেক বেশি জ্ঞানগর্ভ। —এমন ছবি কেউ কখনো চাক্ষুষ করেনি।

—ভুজঙ্গর বিছানায় ব'সে মেঝেয়, ব'সে টি. ভি. দেখছে একদল হনুমান।

—ঠিক যে কায়দায় নিজেরা দেখেন, ঠিক সেইরকম হাঁ ক'রে মর্কটের দল চেয়ে আছে টি. ভি. স্ক্রীণে। ভুজঙ্গরা এতগুলো মানুষ যে ঢুকলেন তাতে দৃকপাত নেই। একের পর এক জ্ঞান হারিয়ে গড়াচ্ছে মেঝেয়, মর্কটের দল কিন্তু নির্বিকার,—

অবিকল মানুষের মত—টি. ভি. দেখার সময় দুনিয়া রসাতলে গেলেও কারোর ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলেন ভুজঙ্গ। কোনরকমে সামলে দুহাত জোড় ক'রে খাবি খেতে খেতে বললেন, 'পাখাটা কি চালিয়ে দেব?'

এই দেশ এই পথ

এয়ার কণ্ডিশণ্ড্ এক্সপ্রেস্। ভিড়ে ঠাসা। ট্রেনটার মাথা থেকে লেজ বার দুই ছুটোছুটি ক'রেও কোন কামরায় ওঠা গেল না। সব কামরার দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। অনেক অনুরোধেও খুললো না। খুলবে কী ক'রে? ভিতরে গাদাগাদি ভিড়। মাথায় মোট নিয়ে মেয়ে-পুরুষ এক পায়ে খাড়া। জানালা গ'লে ঢোকার চেষ্টা করছে অনেকে। জানালায় হুড়োহুড়ি ধাক্কা ধাক্কি। মাথা ঢোকে তো ধড় ঢোকে না। মাল ঢোকে তো মানুষ ঢোকে না। মেয়েকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে রামবিলাসের সাহস হয় না। লছমীকে উঠিয়ে নিজে যদি উঠতে না পারে? কিম্বা নিজে জানালা গলার পর যদি.........।

হাঁপাচ্ছে দু-জনেই। হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ে দেখছে এদিক ওদিক। পরপর তিন দিন এমনি হ'ল। কেন যে মরতে লুধিয়ানা ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল। ভয় ছিল—ঠিকেদার বলবন্ত সিং আবার স্টেশন থেকেই না জোর ক'রে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু তাড়াহুড়োয় পালাতে গিয়ে এমনি হাল হবে কে জানতো? লুধিয়ানা থেকে রামবিলাস যে গাড়িতে উঠেছিল সেটা মোগলসরাই যায় না। তাই নামতে হ'ল মাঝপথে। পরের ট্রেন থেকে টিকিট

বাবুই নামিয়ে দিল। তারপর থেকে আজ তিন রাত মেয়েকে নিয়ে শুধু মোগলসরাই-এর গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু আজও যে ওঠা গেল না। এদিকে রেস্ত' সব শেষ। আজ স্রেফ বার দুই হাতাভর ছাতু খেয়ে কাটিয়েছে। তাহলে কি ফিরেই যেতে হবে জোতদার মহিন্দর সিং-এর খোঁয়াড়ে?

উঃ। কান্না পেল রামবিলাসের। কিছুতেই কি কাঠবেগারি থেকে মুক্তি মিলবে না? কিছুতেই কি ফেরা যাবে না দেশ?—সেই গত চৈতে ওরা বিহার মুল্লুক ছেড়ে এসেছে। বিহারে যখন আকাল, কাজকাম নেই, ঘরে ঘরে ভুখা, পাঞ্জাবে তখন গম তোলার লোক মেলে না। লোভ দেখিয়েছিল ঠিকেদার বলবন্ত সিং—হোশিয়ারপুরে গেলে পেটভর খানা মিলবে, পহেড়না মিলবে আর মিলবে নগদ দশ রুপিয়া রোজ।

নগদ অবশ্য মেলেনি। জোতদার মহিন্দর সিং-এর ক্ষেত খামারে দিনভর গোলামি করার পর রাত্তির মোট বইতো বাপ-বেটিতে। তার থেকেই ট্রেন ভাড়া। কিন্তু এত ক'রেও ট্রেনে যদি উঠতে না পারা যায়.......।

অথচ মতলব পাকা। দেশে ফিরে ভিটে জমি সামলাতে হবে। বৌটা তো খরার সময়েই মরে গেছে—পেটের জ্বালায় অখাদ্য খেয়ে। ছেলে তার আগেই পালিয়েছে। ভিটে জমি বেদখল হয়ে গেলে মুশকিল। সব সামলিয়েই লছমীর জন্য দুলহা-র পাত্তা লাগাবে রামবিলাস। এই ক-মাসেই মেয়েটা যেরকম কলাগাছের মত বেড়ে উঠেছে তাতে আর ঘরে রাখা যায় না। ভাইদের সাথে' পড়শীদের সাথে, মুখিয়ার সাথে বাতচিৎ ক'রে লছমীর একটা মন-পসন্দ শাদি দিতে পারলে তারে আরাম।

এদিকে ঘন্টি বেজে গেছে। মরিয়া হয়ে রামবিলাস মেয়েকে

টেনে হিঁচড়ে একটা রিজার্ভ বগির দরজার দিকে এগোতে লাগলো। সেখানে রীতিমত লড়াই। রক্তারক্তি। ভিড়ের মধ্যে গোঁত্তা খাচ্ছে রামবিলাস, এমন সময় শুনলো কেউ ডাকছে,—রামবিলাস, হো রামবিলাস।

বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে বাজলো। ঠাণ্ডা হাওয়ার মত এক ঝলক ভয় এসে ধাক্কা মারলো মুখে। ঠিকেদার বলবন্ত সিং নাকি? রামবিলাস এদিক ওদিক তাকালো। কিন্তু বুঝতে পারলো না কোত্থেকে কে ডাকছে।

রামবিলাস ভাইয়া। ইধার ইধার, উপে মে আ যাও।

রামবিলাস গাড়ির ছাদে তাকালো। অন্ধকারে হাত নেড়ে ডাকছে কেউ: উপর চঢ়াও, উপর চঢ়াও ঝটপট।

লেকিন·· লেকিন······ঢোক গিলে থু থু খেল রামবিলাস।

জলদি কর, জলদি কর আ যাও। —দুহাত বাড়িয়ে আছে লোকটা। অন্ধকারে তাকে চেনা যায় না। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় ফাঁকা ছাদে?—রামবিলাস মেয়ের দিকে তাকালো।

লছমী ট্রেনে চড়তে খুব ভালবাসে গত সনেই সে জীবনে প্রথম ট্রেনে চড়েছে—বাপের সঙ্গে লুধিয়ানা আসার সময়। জানালার এ পাশে হেলান দেওয়া বেঞ্চি, ও পাশে মানুষজন, ক্ষেত জমিন, ঘরবাড়ি কেমন তুরন্ত দৌড়োয় ···আঃ কী মজা। ট্রেনে চ'ড়ে দেশে ফিরবে ভাবতে ভাবতে কত রাত্তিরে ট্রেনের সিটি শুনে ঘুম ভেঙে গেছে ওর। কিন্তু খোলা ছাদ!—ওখানে ঘর নেই, বেঞ্চি নেই, জানালা নেই।—ঢোঁক গিললো লছমী। ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইল বাপের মুখে।

আরে দেখতি হো কেয়া? ঘন্টি হো গিয়া। জলদি কর।

—ছাদের কম্বল জড়ানো মানুষটা ঝুঁকে হাত বাড়ালো। রামবিলাস মাথা থেকে টিনের তোরঙ্গ আর পুঁটুলি তুলে দিল ছাদে।

তারপর লছমীর দুই বগলে হাত দিয়ে ঠেলে তুললো। সবশেষে নিজে। উঠতে না উঠতেই বাঁশি বেজে উঠলো। বাতানুকুল গাড়িটা ছেড়ে দিল।

এই ফোকরে হাত দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে থাকো। যেন ফস্কে না যায়।—লোকটি বললো।—আর সোয়েটার নেই! প'রে ফেল। তার ওপরে কম্বল জড়াও। বহুৎ ঠাণ্ডি হ্যায়।

বাধ্য শিশুর মত রামবিলাস তোরঙ্গ খুলে বার করলো নিজের হাফ সোয়েটার, মেয়েটার একটা উলের চাদর আর মাফলার। দুটো কম্বল দু-জনের গায়ে ছিল, সস্তায় কিনে বাড়তি দুটো নিয়ে যাচ্ছিল দেশে, পুটুলী খুলে সে দুটোও বার করলো। খুব ধীরে ধীরে চল-ছিল গাড়ি। রামবিলাস মেয়েকে মাফলার, চাদর আর কম্বল দিল। নিজে ফুল সোয়েটার প'রে ছিল। তার ওপরেই হাফ্ সোয়েটারটা প'রে নিল।

কম্বলে পাউ-তক্ জড়িয়ে গিঁট বাঁধো। নইলে হাওয়ায় উড়বে। —কম্বল জড়ানো লোকটা বললো। এতক্ষণ ওর মুখ দেখা যাচ্ছিল না। এখন গাড়ি চলতে প্ল্যাটফর্মের আলোয় ওকে চেনার চেষ্টা করলো রামবিলাস।

আরে ঝগরু না?

হাঁ। আভি তক প্যাহচানা নেহি শাক্তা?

ঝগরুকে চিনতে পেরে হাতে যেন স্বর্গ পেল রামবিলাস। দেশোয়ালি ভাইয়া—বহুৎ ভরসা।

ট্রেনের গতি ক্রমশঃ বাড়ছিল। লছমী একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছিল নীচে। পান-বিড়ির দোকান, চা-ওলা, টিকিট-বাবু, ঘন্টি-বাবু, গুদাম-ঘর—সবপিছনে ফেলে কেমন গড়গড় করে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। যেন মস্ত একটা কেন্নো। এঁকে বেঁকে ঘটাং

ঘটাং শব্দে লাইন বদলাতে বদলাতে যাচ্ছে। কেবিন-ঘরের কোল ঘেঁষে মালগাড়িকে পাশ কাটিয়ে, আজ সারাদিন বাপের সাথে কাটিয়েছে যে বারান্দায় সেটা পেরিয়ে ঐ ইঞ্জিনটার কান মলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গড়গড়িয়ে চলেছে মস্ত গাড়িটা। গাড়ির সামনে হাজার ব্যাটারির টর্চের আলো। সেই আলোয় সার সার ঝুপড়ি ঝোপঝাড়, বিজলী থাম। —সব কেমন ঝলসে উঠেই মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে।

হাতে খৈনি ডলছিল ঝগরু। রামবিলাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, লো, খাও।

ইতিমধ্যে শন্‌শন্ হাওয়া উঠেছিল। যত জোরে ছুটছে গাড়ি তত বাড়ছে হাওয়া। হাওয়ায় যেন বরফের কুচি। ফুটছে চামড়ায়। ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো লছমী।

হনুমান টোপী নহি হ্যায়? কানমাথা ঢাকা হনুমান টোপী?

বড় মেয়েরা আবার হনুমান টুপী পরে নাকি! —রামবিলাস তাই পুঁটুলী থেকে বার করেনি টুপী। সস্তার টুপী ভাইপোদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। এখন বার ক'রে মেয়েকে পরিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও আটকায় না শীত। হাত পা জমে যাচ্ছে। পায়ের সঙ্গে গামছা দিয়ে কম্বল গিঁট বেঁধেও হাওয়া আটকানো যাচ্ছে না।

কেয়া-হুয়া লছমী-মাঈ?—ঝগরু আবার জিগ্যেস করলো। —পাওমে মোজা নেহি হ্যায়?

নেহি।

নিজের পা থেকে মোজা খুললো ঝগরু। হাঁ হাঁ করে উঠলো রামবিলাস: আরে ক্যায়া করতা হ্যায়?—নিজেরটা খুলে…।

আরে মেরা পাওমে ক্যাম্বিস জুতা হ্যায়। —ঝগরু যুক্তি দিল।

মোজা প'রে নিল লছমী। একটু আরাম লাগলো পায়ে। কিন্তু হাত? হাতে হাত ঘষেও কাঁপুনি থামানো যাচ্ছে না। আঙুলগুলো যেন হাতে নেই, খসে প'ড়ে গেছে। কম্বলের সঙ্গে হাতে হাত ঘষতে লাগলো ও।

জোরসে ছুটছে গাড়ি। রামবিলাস খুব খুশি। যাক্। জোতদার মহিন্দর সিং-এর ক্ষেতে-খামারে পেটভাতায় গোলামি করতে আর ওদের ফিরে যেতে হবে না। ঠিকেদার বলবন্ত সিং আর ওকে জেলে ঢোকানোর ভয় দেখাতে পারবে না। মেয়েটার ইজ্জত লোটার ধান্ধা করতেও পারবে না কেউ। দেশ যাচ্ছে ওরা—দেশ! দেশে খরা আছে?—থাক না! ভুখ আছে?—থাক না, তবু তো দেশ। আপনা দেশ, আপনা ঘর, আপনা ক্ষেতি।

ছাদের লোকে হাততালি বাজিয়ে গান গাইছিল। গাড়ির ঘট্‌ঘটাং ঘটঘটাং আওয়াজ ছাপিয়ে ছাদে কীর্তনের ঘটা। জয় রামজী, জয়, জয় হনুমানজী, জয় সীয়ারাম, জয়, জয় হনুমান জয়। ঝগরু গাইছে মাথা ঝাঁকিয়ে। রামবিলাসও গুনগুনিয়ে উঠলো।

ট্রেনের তুপাশে অন্ধকার। গাছ-পালা ঝোপঝাড় ক্ষেত-জমিন সব চাপচাপ অন্ধকার মেখে পড়ে আছে। দু-পাশে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না লছমী। কেবল বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। দাঁতে দাঁত ঠেকে যাচ্ছে। ঠকাঠক আওয়াজ হচ্ছে মুখে। লছমী কম্বল টেনে মুখের মধ্যে ভরতে লাগলো।

ডাণ্ডা মাৎ ছোড় বেটি। —ঝগরু চিৎকার ক'রে বললো। আস্তে বললে কিছু শোনা যায় না—এত হাওয়া আর আওয়াজ। —হুঁশিয়ার। গাড়ি বেরেক মারলে ছিটকে পড়ে লোক। ফুটা সামহালকে।

পুঁটুলি খুলে আরো গামছা বার ক'রে মেয়ের কম্বলের সঙ্গে নিজেরটা বেঁধে নিল রামবিলাস। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে হাজার বাতির মশাল। ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। সেই আলোয় ছাদে মানুষের মেলা দেখলো লছমী। যেন মজঃফরপুরের মেলায় চড়কি। এ চড়কি অবশ্য ঘোরে না, এটা হাওয়াই জাহাজের মত অন্ধকারে ভেসে থাকে।

পাশ দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে চলে গেল ট্রেনটা। ছাদ থেকে ঐ গাড়ির কাঁচ লাগানো জানালা দেখলো লছমী। ভেতরে আলো। ভেতরে গরম। আরাম। ঘুম।

গাড়ির গতি কমতে শুরু করেছে। ছাদে চিৎকার উঠলো—হুঁশিয়ার, বজরঙ্গবালী সামনে যে শির সামহালকে হুঁ-শি-য়া-র।

ধীরে ধীরে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকছে গাড়িটা।
ঝপাঝপ মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ছে লোক। লছমীকে নিয়ে রামবিলাসও সষ্টাঙ্গ হ'ল সামনের লোকের পায়ের উপর। গমগম গম্‌গম্ গা ছম্‌ছম্ আওয়াজ তুলে গাড়িটা সুড়ঙ্গে ঢুকছে। পাহাড় কেটে বানানো সুড়ঙ্গ। শুয়ে শুয়েই লছমী দেখলো মাথার বিঘৎ খানেক ওপরে পাথরের চিকন ছাদ। কেমন গরম গরম। হাত ছুঁয়ে দেখলো বরফের মত ঠাণ্ডা। দু-পাশে পাথরের দেয়াল চুইয়ে গড়াচ্ছে জল। কামরার জানালায় কাঁচ ভেদ ক'রে যেটুকু আলো পড়ছে দেয়ালে তাতে চকচক করছে জল। আলো ঠিকরে পড়ছে ইতিউতি। ইঞ্জিনের কপালের আলোটা আয়নার পড়া টর্চের আলোর মত ছিটকে কেঁপে কেঁপে নাচছে। গাড়ির মাথায় সারি সারি কম্বল নিথর পড়ে আছে যেন কুম্ভ মেলায় দেওতার কাছে শির নোয়াচ্ছে সবাই।

টানেল পেরিয়ে যেতে বাপকে বললো, এ পর্বত হ্যায় কেয়া ?

হাঁ, হিমালয়। পেরনাম কর।

দু-হাত কপালে ঠেকালো রামবিলাস। ওর দেখা দেখি লছমী। জোর আওয়াজ উঠলোঃ জয় বজরঙ্গবালী কি—জয়!

গাড়ির গতি আবার বাড়ছে। বাড়ছে অন্ধকার। বাড়ছে শীত। বাড়ছে লছমীর কাঁপুনি। ঝড়ের দাপটে বুঝি উড়ে যাবে সে। শক্ত ক'রে ফোকর ধ'রে রইলো লছমী। কিন্তু আঙুল যে অবশ। দু-হাত বারে বারে ঘষেও আঙুল নাড়ানো যাচ্ছে না।

কেয়া হুয়া লছমী মাঈ? —ঝগরু কিছু বললো। কিন্তু ঝড়ের দাপটে আর ঘটাং ঘটাং আওয়াজে সবটা শুনতে পেল না লছমী। বললো, আ-আ-আঙ্গুল······আঙুল।

ঠাণ্ডায় ওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ঝগরু প্রায় চিৎকার ক'রে রামবিলাসের দিকে ঝুঁকে বললো—হাত-মোজা নেহি হ্যায়?

নেহি তো।

ঠিক হ্যায়। আমারটা নিয়ে মেয়েকে পরিয়ে দাও।

লছমীকে হাত-মোজা খুলে দিয়ে ঝগরু খৈনির কৌটা থেকে চূণ বার ক'রে হাতে ঘষে নিল। এতে নাকি হাত গরম থাকে।

ইতিমধ্যে কাশতে শুরু করেছিল রামবিলাস। কাশছে অনেকেই। সামনে পিছনে ঘং ঘং কাশির আওয়াজ। কাশতে কাশতেই কীর্তনে গলা মেলাচ্ছে রামবিলাস। কাল-রাত্তিরে এমনি সময় ও দেশের ভিটেয় গিয়ে নিদ্ যাবে। বিনি মজুরি গোলামি আর খাটতে হবে না। আঃ।

লছমীর মাথার মধ্যে চিনচিন করছিল। দু-হাঁটুর মধ্যে কম্বল-জড়ানো মাথাটা ঢুকিয়ে ও বসেছিল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে হাওয়ায়। তবু কম্বলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। আন্ধেরা, স্রিফ আন্ধেরা। চোখে স'য়ে গেল বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, গাঁও

বোঝা যায়। চেয়ে চেয়ে লক্ষ্মী পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর দেখে। ছোট ছোট কুঁড়ে। তার মধ্যে খড়ের বিছানায় চটের বস্তা পেতে কম্বল জড়িয়ে······আঃ। কেউ বুঝি বাঁশি বাজিয়ে গান গাইছে বিছানায়ঃ এ জিন্দেগী এ দুনিয়া এ হামারা এ তুমহারা।

ফিল্মীগান গুনগুনিয়ে উঠলো লছমীর মনে। লুধিয়ানায় গমের লরীতে এসে সিনেমা দেখেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে ছবির পর ছবি।

লছমী, এ লক্ষ্মী। —ব'লে উঠলো ঝগরু, গির যাওগী। নিদ্ মাৎ যাও বেটি।

শুনতে পেল না লছমী। রামবিলাস ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে তুললো। কিন্তু কান ভোঁ ভোঁ করছিল মেয়েটার। চিনচিনে জ্বালাটা এখন বেড়েছে। ধু ধু মাঠের অন্ধকার দিগন্তে চেয়ে চেয়ে ও দেশ-গাঁও-এর কথা ভাবতে লাগলো। বাপ বলেছে দেশে নিয়ে গিয়ে ওর শাদি দেবে। কার সাথে শাদি হবে ওর কে জানে।—যার সাথেই হোক সে এখন ঘুমোচ্ছে তার গরম বিছানায়। নাকি কম্বল জড়িয়ে গাইছে গান;—এ জিন্দগী এ দুনিয়া এ হামারা এ তুমহারা।

সামনে জোনাকির মত মিটমিট আলো দেখছিল রামবিলাস। কম্বলের মধ্যে জ্বলছে। বুঝিয়ে দিল ঝগরু—গাঁজা টানছে ওরা। গাঁজা টানলে গরম হতো শরীরটা।—রামবিলাস ভাবলো—মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ ভাবটাও কাটতো। কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে ভরসা হয় না। মেয়েটা যেরকম হেলে পড়ছে ···।

এই সময় দূর থেকে আবার একটা আলো এগিয়ে আসছে দেখা গেল। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, সামহালকে। —আওয়াজ উঠলো ছাদে। মেয়েকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো রামবিলাস। পাশ দিয়ে দানোর মতো ছুটে চলে গেল ট্রেনটা।

লছমী হঠাৎ লক্ষ্য করলো ওর পা অবশ হয়ে গেছে। উরু থেকে একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত। একদম নড়ানো যাচ্ছে না। হাত দিয়ে দেখলো হাত-মোজা ভেদ ক'রে বিঁধছে ঠাণ্ডা—যেন বরফ। পা তোলবার চেষ্টা করলো ও। পারলো না। হাত দিয়ে ঘষলো বার কয়। কিছুই হ'ল না। চিমটি কাটলো। ব্যথা লাগলো না। ভয়ে কান্না পেল ওর। বাপের দিকে ফিরে বললো, মে···মে··· মেরী-পা-পাও মেরী পা-পাও······।

জড়ানো কথা বুঝতে পারলো না রামবিলাস। ঝুঁকে পড়লো ঝগরু। তারপর উঠে এসে লছমীর পা দু-হাতে দলাই-মালাই করতে লাগলো। ওঠালো-নামালো বারকতক। ধীরে ধীরে শান্ ফিরে পেল লছমী। বললো, টিশ-টিশ-টিশন্ এলে অন্দরমে ঘুষা যাবে না?

নেহি। লেকিন গরমা গরম চা খাওয়া যাবে। —আশ্বাস দিল ঝগরু। —তাতেই তাগৎ মিলবে।

রামবিলাস ওর পুঁটুলি খুললো আবার। ছেঁড়া চাদর, গামছা যা ছিল সব বার করলো। এমন কি মোটা গেঞ্জিটা পর্যন্ত। সব কিছু দিয়ে জড়িয়ে দিল লছমীর পায়ে হাতে। তারপর নিজের কোলে বুকের আড়ালে বসালো মেয়েকে। বরফ বেঁধা ঝড়ের দাপট এতে কিছু কম হবে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল লছমীর। কানে শুনতে পাচ্ছিল না। মাথার মধ্যে যন্ত্রনা হচ্ছিল। বাপের বুকে মাথা ঠেকিয়ে ঝিমোতে লাগলো। রামবিলাস যেমনি কাশে, লছমী নিজের মাথার মধ্যে হৈ-হল্লার মত আওয়াজ পায়। যেন জমিদার হুকুম চাঁদ-জীর লেঠেলরা ক্ষেত পাহারার আওয়াজ দিচ্ছে: ক্ষেত মে দূর হঠো, হু঳-শি-য়া-র।

এ লছমী লছমী। —রামবিলাস ঠেললো মেয়েকে। নিদ্ মৎ যাও বেটী। টিশন এলে চা খেতে হবে তো।

বাপের পানে চেয়ে ঘন শ্বাস ফেললো লছমী। গাড়ির কপালের আলোয় দেখলো জোড়া রেললাইন প'ড়ে আছে আঁকাবাঁকা পথে। ঐ পথে দেশ, ঐ পথে গাঁও। গাঁও মে রমেশ চাচা হ্যায়, তহশিলদার কাশীনাথ জী ভি হ্যায়। আছে সরস্বতী, আছে বিন্দিয়া। বিন্দিয়া বলেছিল সে পাটনা গিয়ে মামার কাছে থেকে গানের ইস্কুলে গান শিখবে। হাই ইস্কুল পাশ দিলেই নাকি পাটনা রেডিও-টিশন ওকে গান গাইবার জন্যে ডাকবে। বিন্দিয়া এখন কোথায়? আভি কাঁহা গো রে তু?……

পাশে ধূ ধূ মাঠে চাইলো লছমী। একী! ফিকে জোছনায় দেখা যাচ্ছে সব কিছু। ক্ষেত-জমিন, বনবাদাড়, ছোটা সা ঘর। আহির চাচার মেয়ে কমলীর গত সনে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল। ওর কি শাদি হয়ে গেছে? হয়তো এখন দুলহাব ঘর করছে সে। খড় বিছানো গরম বিছানায় কম্বলের ভিতরে দুলহার কোলে মাথা রেখে গুনগুণিয়ে গাইছে গান: এ জিন্দেগী এ দুনিয়া এ হামারা এ তুমহারা।

সমানে জল পড়ছে চোখ দিয়ে। সমানে কাশছে বাপ। মুখে খৈনি ঠেসে বুঁদ হয়ে বসে আছে ঝগরু। লছমী সামনে তাকিয়ে অবাক হল: কম্বলের আড়ালে আগুনের ফুলকি। বাড়তে, বাড়তে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো আগুন। হৈ চৈ উঠলো সামনে। লাফ দিয়ে উঠলো ঝগরু। ঝড়ের দাপটে দাউ দাউ জ্বলছে কম্বল। প্রানপনে গিঁট খুলছে আগুন-জড়ানো লোকটা। তারপরই উড়ে গেল কম্বলটা। জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল উল্কার মত।

লছমী বোবা। শালা বুর্বাক, গিদধর কা বাচ্ছা।—গালাগাল

দিতে দিতে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে ঝগরু।

এই সময় আবার সেই আলোর ফোকাস। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার গাড়ী আতি হ্যায়। —রব উঠলো ছাদে। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো রামবিলাস।

গাড়ি পেরিয়ে গেলে আবার জোছনার মাঠে চোখ ফেরালো লছমী। মাঠ থেকে জোছনার আকাশে। এক ফালি চাঁদ। চাঁদকে ঘিরে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মিটমিট তারা। ওরাও চলেছে। দেশ যাচ্ছে কি সবাই?

এ জিন্দেগী এ দুনিয়া এ হামারা এ তুমহারা। গুনগুন করার চেষ্টা করলো লছমী। কিন্তু কাঁপছে ঠোঁট, ঠকঠক করছে দাঁত। বুঝি দাঁত-কপাটি লেগে গেছে। ঝড়ের বেগে বরফ কুচি আর বিঁধছে না। যন্ত্রনাও কমে আসছে। কেমন যেন অসাড় লাগছে। মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ। শোনা যায় না কিছু। শুধু ঘটাং ঘট, ঘটঘট ঘটাং—একঘেয়ে চাকার আওয়াজ যেন ঘুম পাড়ানি ছড়া। তাকানো যায় না। চোখ থেকে জল পড়ছে সমানে। মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে হাজার গলার হৈ চৈ। যেন মজঃফরপুরের মেলায় যাচ্ছে সবাই দল বেঁধে। সরস্বতী, বিন্দিয়া, কমলী আর কমলীর দুলহা। গান গাইছে বিন্দিয়া নাকি কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ? যেন পূজো হচ্ছে!……শাদি হবে ওর।……বাপ বলেছে দেশে গিয়ে বাংলার নক্সাপাড় তাঁত-শাড়ি কিনে দেবে। ঐ শাড়ি পড়লে কেমন দেখাবে ওকে?……দুলহা প্যায়ার করবে তো?……কী করছে সে এখন? খড় বিছানো গরম বিছানায় রাত জেগে জেগে সে কি গাইছে গান?—এ জিন্দেগী এ দুনিয়া এ হামারা এ তুমহারা… ‥।

মেয়েটা ঢলে পড়েছিল বুকে। রামবিলাস ওকে বসিয়ে

আঁকড়ে ধরলো। কম্বলগুলো আপাদমস্তক আরো ভালো ক'রে চাপা দিল। তারপর কাশতে লাগলো ঘং ঘং। কাশতে কাশতে হৃদপিণ্ডটাই বুঝি বেরিয়ে পড়বে কফ্ এর সঙ্গে।

ঝগরু আর গান গাইছে না। সামনে পিছনে গানের আও-য়াজ, তালির আওয়াজও আর শোনা যায় না। ঠাণ্ডায় কি কানে তালা লেগে গেল? নিঃশ্বাসেও কষ্ট হচ্ছে। জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলো রামবিলাস।

ছাদে হৈ চৈ উঠলো এই সময়। দূরে দেখা যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু আলো। ছোট ছোট জোনাকির মত জ্বলছে।

টিশান্ টিশান্।—আওযাজ দিল ঝগরু। রামবিলাস মেয়ের দিকে ঝুঁকলো। লছমী, টিশান আতি হ্যায়, টিশান।

লছমী সাড়া দিল না।

শীত লাগছে খুব? —বললো ঝগরু। টিশানে গরম চা খেলেই চাঙ্গা লাগবে।

লছমী কিছু বললো না। ঘুমিয়ে গেল নাকি?

এ লছমী, লছমী। টিশানে গরম চা খাবি তো? —রাম-বিলাস ওকে ঝাঁকুনি দিল। লছমী এখনো চুপ। নেতিয়ে পড়েছে রামবিলাসের বুকে। ট্রেন স্টেশনে ঢুকে ধীরে ধীরে থামছে। জোরে জোরে লছমীকে ঠেলতে লাগলো ঝগরু। লছমী কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। ঝগরু তাকাচ্ছে রামবিলাসের মুখে। রামবিলাস ঝগরুর মুখে।

ট্রেন থামতেই ঝগরু বললো, চল উতার চল।

কিঁউ?

বহুৎ ঠাণ্ডা। লছমী…

কথা শেষ করলো না ঝগরু। রামবিলাস কিন্তু নামতে

চাইলো না। বললো—নেমে যদি উঠতে না পারা যায়?

উতারনে হোগা। —ঝগরু জোরে বললো—লছমী কো ভবিষ্যৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।

আবছা আলোয় রামবিলাস মেয়ের মুখ দেখলো। তারপর স্টেশন। স্টেশনে পুলিশ। গাড়ির ছাদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে ধমকাচ্ছে। ছাদ থেকে নেমে যাচ্ছে লোক। নেমেই টলছে। টলতে টলতে প'ড়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে।

উৎরেঙ্গে নেহি। —রামবিলাস মেয়েকে আঁকড়ে ধরে বললো। —ওর খুব ভয় নামলেই পুলিশ ধ'রে চালান দেবে হোশিয়ারপুর। ফেরৎ পাঠাবে মহিন্দর সিং এর খামারে। ঠিকেদার বলবন্ত সিং-এর লোক নিশ্চয়-ই টিশানের কোথাও ওঁৎ পেতে আছে।

উতর চল।—রামবিলাসের হাত ধ'রে টানতে লাগলো ঝগরু। —লছমীকা বহুৎ বীমার হ্যায়।

নেহি। —শক্ত হাতে ছাদের ফোকর ধ'রে রইল রামবিলাস।

লেকিন ভিতর মে তো যানা হোগা। —ধমক দিল ঝগরু।

ভিতরমে?—ফ্যালফ্যাল চোখে চাইলো রামবিলাস।—কামরেকা অন্দরমে?

হ্যাঁ। লোক তো নামছে। অন্দরমে জায়গা মিল ভি শাক্তা।—আবার হাত ধ'রে টানলো ঝগরু।—চল্, উতার চল্।

নেহি। —লছমীকে আঁকড়ে ধরলো রামবিলাস।—তুমি আগে দেখো ভিতরে ঢোকা যায় কিনা।

ঝগরু একাই নামলো। খানিক ছুটোছুটি করলো সামনে পিছনে। কোথাও দরজা-জানালা খোলা নেই। ছাদ থেকে পুলিশ যাদের নামিয়ে দিয়েছ তারা পাদানিতে ঝুলে দরজা ধাক্কাচ্ছে সমানে। মেয়ের মুখের পাশে মুখ রেখে রামবিলাস প্ল্যাটফর্মে চা-এর স্টল

দেখছিলো। লাঠি উঁচিয়ে ছুটো পুলিশ আসছিল। দেখেই তাড়াতাড়ি রামবিলাস মেয়েকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লো ছাদে। শুয়ে শুয়েই কম্বলের তলায় হাত ঢোকালো। হ্যাঁ এই তো। জামার ভেতর পকেটে টিকিট-ছুটো দিব্যি র'য়েছে। কিছুতেই ওরা আর গাড়ি থেকে নামাবে না।

শুয়ে শুয়েই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা শুনতে পেল রামবিলাস। তারপর ঝগরুর চিৎকার।

কাঁহা হ্যায় তুম? উতার আও, উতার আও রামবিলাস।

মাথা তুললো রামবিলাস। উঁকি মেরে ঝগরুকে দেখে বললো, ভিতরমে ঘুষা যায়গা?

নেহি। লেকিন আভি উতরনে হোগা। উতার আও, উতার আও জলদি।

নেহি।—রামবিলাসের এক জবাব।

লছমী কো বহুৎ বীমার হ্যায়। বেহুঁশ। উতার আও, —ছাদের দিকে দু-হাত বাড়ালো ঝগরু।

নেহি।—লছমীকে তুলে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিল রামবিলাস। দেশ যানে হোগা।

মোগলসরাই এখান থেকে খুব কাছে।—ঝগরু চিৎকার ক'রে বললো।—টিশনে রাতটা কাটিয়ে সকালের প্যাসেঞ্জার গাড়িতেই যাওয়া যাবে।

নেহি উৎরেঙ্গে।

ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠলো মরীয়ার মত ঝগরু হাত বাড়াচ্ছে ওপরে। —পাগলামি ক'রো না রামবিলাস। লছমী মর যায়গা। উতার আও জলদি।

নেহি। তুম আ যাও।

ট্রেনটা ছাড়লো এই সময়। চিৎকার করতে করতে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে ঝগরু। তারপর দৌড়োচ্ছে। ক্রমশঃ ওর চিৎকার হারিয়ে যায় ট্রেনের পিছনে।

গাড়ি স্টেশন ছেড়ে অন্ধকার মাঠে পড়লে রামবিলাস মেয়ের মুখের সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল।

লছমী. লছমী-মাঈ—মেয়েকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো রামবিলাস। কোন সাড়া না পেয়ে ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলো ওর মুখ। লছমী কি ঘুমোচ্ছে? নাকি বেঁহুশ? নাকি···।

লছমী, এ লছমী, সামনেই তো মোগল সরাই। এক্ষণি পৌঁছে যাব।

লছমীর কিন্তু এতটুকু সাড়া নেই। নেতিয়ে আছে বাপের বুকে। রামবিলাস তাকালো সামনে-পেছনে। ছাদ থেকে বেশির ভাগ লোকই নেমে গেছে। যারা আছে প্রায় সবাই শুয়ে আছে চুপচাপ। ওরাও কি লছমীর মতই··· ।

লছমী-মাঈ, বহুৎ ঠাণ্ডা হ্যায়. ক্যা? —যেন আপন মনেই বিড়বিড় করলো রামবিলাস। তারপর খুলে ফেললো নিজের গায়ের মোটা গেঞ্জি আর হাফ সোয়েটারটা। চাপিয়ে দিল লছমীর শরীরে। তারপর খুললো ফুল সোয়েটারটা। সেটাও চাপালো। শেষে নিজের কম্বলটাও খুলে মেয়েকে জড়িয়ে দিল।

কিন্তু মেয়েটা যে কানি-ন্যাকড়ার পুঁটুলির মত পড়েই যাচ্ছে। কিছুতেই যে লছমীকে বসিয়ে রাখা যাচ্ছে না! যেন লছমী নয়, নবম মাটির তাল।

ভয় পেল রামবিলাস। ভীষণ ভীষণ ভয়। বড় অসহায়, একা,—ভীষণ একা লাগছে ওর। এত ডাকছে সে, এত ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তবু মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না কেন?

রামবিলাসের আর কথা বলার শক্তি ছিল না। তালগোল পাকানো মেয়েটাকে আঁকড়ে বুকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে সে চিৎকার করার চেষ্টা করলো প্রাণপণ। কিন্তু কথা বেরলো না মুখ দিয়ে। তখন মেয়ের গালে গাল রেখে দূরের অন্ধকারে চেয়ে আঙ্গুল তুললো সে।

বুঝি বোঝাতে চাইলো—ডরনে কা কুছ নেহি হ্যায়। ভোরেই পৌঁছে যাব দেশ,—পথ শেষ হয়ে এল।